contents

ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﵀ এর
'নাওয়াকিদুল ইসলাম'-এর ব্যাখ্যা

ঈমান ভঙ্গের কারণ

শাইখ সুলায়মান ইবনু নাসির আল উলওয়ান

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. প্রণীত
"নাওয়াকিদুল ইসলাম" এর ব্যাখ্যা

ঈমান ভঙ্গের কারণ

ঈমান ভঙ্গের কারণ

মূল

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ)

ব্যাখ্যা (আরবি)

শাইখ সুলায়মান ইবনু নাসির আল উলওয়ান

অনুবাদ

মাসউদ আলিমী

সম্পাদনা

মুফতি হারুন ইজহার
মুফতি হুমাইদ সাঈদ কাসেমী

সীরাত পাবলিকেশন

ঈমান ভঙ্গের কারণ
গ্রন্থস্বত্ব ©সাজিদ ইসলাম
প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০১৮

ISBN: 987-984-34-5220-7

প্রকাশক
সীরাত পাবলিকেশন
www.facebook.com/seeratpublication
Email: seeratpublication@yahoo.com

পরিবেশক এবং প্রাপ্তিস্থান
দারুল নাহদা
শপ#৩১৫, দ্বিতীয় তলা, ৩৮/৩-কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৭৩৯১৫২১৯৭

অনলাইন পরিবেশক
wafilife.com
rokomari.com
sijdah.com

পৃষ্ঠাসজ্জা, বানান এবং ভাষা সম্পাদনা: সাজিদ ইসলাম

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ

মুদ্রিত মূল্য: ১৬৭৳

Iman Vonger Karon By Shaykh Sulayman Ibnu Nasir Al Ulwan Translated By Masud Alimi, Published By Seerat Publication, Dhaka, Bangladesh.

contents

“

ফিলিস্তিনের এক ছোট্ট বালক। মাথার উপর ইসরায়েলি বিমান দেখে ভয় লাগে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে সে জবাব দিয়েছিল, *“আমাদের মাথার উপর তাদের বিমান উড়ে, কিন্তু তারা জানে না, তাদেরও উপরে আমাদের আল্লাহ্ আছেন।”*

ভালো থেকো হে বালক! মেরুদণ্ডহীন এই ঘুমন্ত জাতির মানুষগুলো তোমার মতোই তাদের রবকে চিনতে শিখুক। তোমাদের আকাশেও পাখিরা ডানা মেলে উড়ে বেড়াক। বিজয়ের এক মিছিলে—হঠাৎ একদিন তোমার সাথে দেখা হয়ে যাক।

”

সূচী

একটি মূল্যায়নপত্র ৭
ভূমিকা ৯
ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ ১৩
আল্লাহর সাথে শিরক ১১
বান্দা ও আল্লাহর মাঝে অন্য কাউকে মাধ্যম বানানো ২৯
মুশরিকদের কাফির মনে না করা, তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করা। ৩৮
রাসূল ﷺ-এর আনীত দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা কিংবা আইনকে উত্তম মনে করা। ৫৩
দ্বীন ইসলামের কোন বিষয়ে বিদ্বেষ পোষণ করা ৬১
দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করা ৬৭
কিছু অর্জন কিংবা বর্জনের জন্য যাদু করা (ব্ল্যাক ম্যাজিক), যাদুর উপর সন্তুষ্ট থাকা, মনে প্রাণে যাদুকে পছন্দ করা। ৭২
মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা। ৮৪
কাউকে শরীয়তে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উর্ধ্বে বলে মনে করা ৮৮
আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। ৯৬
শেষ কথা ১০০
পরিশিষ্ট ১০৪
ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﵀ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১০৭
শাইখ সুলায়মান ইবনু নাসির আল উলওয়ানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১১০

একটি মূল্যায়নপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

আকিদাহ্ একজন মুসলিমের জীবনে প্রধান মৌলিক বিষয়। এটা ঈমান আর কুফরের মধ্যে এমন এক স্পষ্টতর রেখা নির্মাণ করে দেয় যার মাপকাঠিতেই ইসলামে একজন মুসলিমের কর্ম ও বক্তব্যকে সর্বদা বিচার ও মূল্যায়ন করা হয়। ইসলাম এভাবে বিশ্বাস ও দর্শনের এমন স্থির ও অপরিবর্তনশীল কিছু গিঁট সৃষ্টি করে দিয়েছে—যা খুলে গেলে আর ঈমানি স্বকীয়তার পরিচয় বহাল থাকেনা। গত হিজরি শতকের অন্যতম আরব সংস্কারক শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (ﷺ) আরব সমাজে জেঁকে বসা শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছিলেন তার বুনিয়াদ তিনি রেখেছিলেন আকিদাহ্র উপর। ভারতবর্ষে সৈয়দ আহমদ শহীদ (ﷺ) এর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ওয়াহাবি আন্দোলন নামে আখ্যা দিয়ে একটা প্রোপাগান্ডার সূচনা করেছিল। অথচ দুটো আন্দোলনের মাঝে কোনো কার্যকর যোগসূত্র ছিল না। তথাপি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের সংস্কার আন্দোলনের ন্যায় ভারতে সৈয়্যদ আহমদ শহীদের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রেরণা ছিল আকিদাহ্র বিষয়টি।

একবিংশ শতকের প্রারম্ভিক দশকগুলোতেও আমরা লক্ষ্য করছি আকিদাহ্ একটি পরিত্যাজ্য ও চরমভাবে অবহেলিত বিষয়ে পরিণত হয়ে আছে। এমনকি মূলধারার ইসলামপন্থীরাও এ ব্যাপারে মারাত্মক উদাসীনতার শিকার। আমরা আকিদাহ্র পাঠকে গৌণ রেখে এবং এটাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়া ও রাজনীতি এবং জিহাদের বাহ্যিক কর্মসূচী নিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। অথচ আকিদাহ্র বিশুদ্ধতা ছাড়া এসব কাজের ভিত্তিমূল নড়বড় থেকে যেতে বাধ্য।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের *"নাওয়াকিদুল ইসলাম"* একটি মৌলিক রচনা। আমরা ওযু ভঙ্গের কারণ যতটা সহজে আত্মস্থ করেছি, সেদিকের বিবেচনায় ঈমান ভাঙ্গার কারণ সম্পর্কে আমাদের পড়াশুনা ও চিন্তার বড়ই বেহাল দশা। বইটির সুন্দর ব্যাখ্যা লিখেছেন শাইখ সুলায়মান ইবনু নাসির আল উলওয়ান। তাঁর সফল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় তা উপস্থাপন করেছেন তারুণ্যদীপ্ত প্রতিভাবান আলিম মাওলানা মাসউদ আলিমী।

আকিদাহর মৌলিক বয়ানে সালাফ এবং খালাফের সকল ধারাগুলো একমত। তবে তার ব্যাখ্যায় উক্ত ধারাসমূহের মাঝে কিছু ইখতিলাফ বিদ্যমান রয়েছে। এই বইয়ে তার কিছু ঢেউ লাগতে পারে, তবে তাতে ইনশাআল্লাহ আহলে সুন্নাহর আকিদাহর বুনিয়াদী মৌলিকত্ব আশা করি খর্ব হবে না। আমরা জানি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ঈমান ভঙ্গের কারণের বিবরণে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। হয়তো এখানে শাইখের নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হতেও পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ আকিদাহর যে মৌলিক আবেদন এ বই রচনা করেছে—তার সমকালীন উদাহরণ কম। একটা সমাজে যখন নানা ভ্রান্ত চেতনা সীমালঙ্ঘন করে তখন সময়ের দাবি মতে তাকে সময়োচিত জবাব দিতে হয়। পরবর্তী সময় হয়তোবা এটাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে।

সুতরাং আমাদের বোধগম্য হওয়া চাই যে—আকিদাহর মৌলিক বয়ান আহলে সুন্নাহর সকল প্রজন্মে এক ও অভিন্ন ছিল। কাল ও সময়ের বিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট তার ব্যাখ্যায় ভিন্নতা আনতেই পারে। এটাতে মৌলিকত্ব বিনষ্ট হয় না। এসব বাস্তবতা অনুধাবনে অক্ষম হলে বিপদ আছে। আমাদের সমাজে ইসলাম চর্চায় যে সঙ্কট বিরাজ করছে তার মর্মমূলে রয়েছে আকিদাহ বিবর্জিত ইসলামি অনুশীলন। বাজারে এ বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থের খরা চলছে। আশা করি উক্ত বইটি এ শূন্যতা পূরণে বিশাল অবদান রাখবে। বইটি আমরা মোটামোটি সম্পাদনা করেছি। বাকি বিষয়গুলো পাঠকের মতামতের জন্য ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা লেখক, টীকাকার এবং অনুবাদকের প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন।

মুফতি হারুন ইজহার
মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূম আল-ইসলামিয়া
লালখান বাজার

ভূমিকা

লেখক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (ﷺ) বলেন,

“পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। জেনে রাখুন, ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ...”

কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে লেখক তাঁর বইয়ের সূচনা করেছেন 'বিসমিল্লাহ' এর মাধ্যমে। প্রিয়নবি (ﷺ) চিঠিপত্র, চুক্তিনামা ও লেখালেখির শুরুটা করতেন 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা। এই সুন্নাহটি অসংখ্য দলিল-প্রমাণের আলোকে প্রমাণিত। যেমন- রাসূল (ﷺ) স্ত্রী সহবাস, খাদ্যগ্রহণ সহ যাবতীয় কাজ 'বিসমিল্লাহ' এর মাধ্যমে আরম্ভ করতেন। এটা কারোরই অজানা নয়।

অতঃপর তিনি লিখেছেন,

“... জেনে রাখুন, ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ...”

লেখক اعلم শব্দটা এনেছেন যা আদেশ সূচক। শেষাক্ষরে সাকিন করে পড়তে হবে। এটা علم শব্দ থেকে নির্গত। আর 'ইলম' বলা হয় অন্তরের এমন দৃঢ় বিশ্বাসকে—যা বাস্তবসম্মত। তার মানে এভাবে বলার দ্বারা কোনো বিবেকবান ব্যক্তিকে বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পাঠককে বলা হচ্ছে, ঈমান ভঙ্গের যে সকল কারণ বর্ণনা করা হবে—সে ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগী হোন! যাতে করে আপনি তা সঠিকভাবে বুঝতে পারেন। তার উদ্দেশ্যটা ধরতে পারেন। এবং বের হয়ে আসতে পারেন অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে। ভ্রষ্টতার মায়াজাল থেকে হিদায়াতের বাহুডোরে।

বাক্যে نواقض শব্দটা বহুবচন। এটা কর্তাবাচক বিশেষ্য। যার অর্থ—ভঙ্গকারী। আরবি ভাষায় কর্তাবাচক বিশেষ্য (اسم فاعل) যখন বিবেকহীন বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তার বহুবচন আসে فواعل এর ধাঁচে।

আর نواقض الاسلام অর্থাৎ ঈমান বা মুসলমানিয়্যাত ভঙ্গের কারণসমূহ। এগুলো হলো সে সমস্ত অনিষ্টকারী কাজ, যার উপর তা সংঘটিত হয়—তাকে ধ্বংস করে দেয়। তার সব নেক আমল বরবাদ করে দেয়। এমনকি সে চিরস্থায়ী জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

একারণেই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক ঈমান ভঙ্গকারী এসকল বিষয়ে পূর্ণ অবগত থাকা। অন্যথায় কখন যে সে এসকল ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়ের ফাঁদে পড়ে যাবে—তা টেরও পাবে না। যেমন আজকাল কত মানুষ দাবি করে সে মুসলিম, এবং খাতা কলমে আর আদমশুমারিতে সে মুসলিমও বটে। কিন্তু বাস্তবে সে আর মুসলিম নেই।

আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন।

পরের শব্দ عشرة نواقض অর্থাৎ ঈমান ভঙ্গকারী কারণ মোট দশটি। আসলে তা দশেরও অধিক। কিন্তু শাইখ রাহিমাহুল্লাহ এই দশটি গ্রহণ করেছেন, যেহেতু এগুলোর উপর সকল ইমাম ও আলিম একবাক্যে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। অথবা বলা যায়, ফকীহগণ মুরতাদ হয়ে যাওয়ার যত সব আলোচনা ও কারণ বর্ণনা করেছেন, তা এই দশটির মধ্যেই। ইনশাআল্লাহ, শীঘ্রই এগুলোর সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ সামনে আসবে।

ঈমান ভঙ্গের প্রথম কারণ
আল্লাহর সাথে শিরক

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (ﷺ) বলেন,

"...ঈমান ভঙ্গের প্রথম কারণ হলো ইবাদাতের শিরক।" অর্থাৎ ইবাদাতে আল্লাহর সাথে শিরক করা।[১] আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরিক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল।" (সূরাহ নিসা ৪:৪৮)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

"তারা অবশ্যই কুফরি করেছে যারা বলে, মারইয়াম পুত্র মাসীহই হচ্ছেন আল্লাহ। মাসীহ তো বলেছিল, হে বনি ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হলো জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরাহ মাইদা ৫:৭২)

লেখক রাহিমাহুল্লাহ ঈমান ভঙ্গের দশ কারণের বর্ণনা শুরু করেছেন 'শিরক' এর আলোচনা দিয়ে। কেননা, এটাই সবচে বড় পাপ এবং আল্লাহর সাথে বান্দার সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা। শিরক করা মানে আল্লাহর একক কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্বকে অস্বীকার করা। তাঁর উপযুক্ত উপাস্য হওয়াকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা। শিরক মানে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই বিশেষ, এমন কোনো বিষয়ে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ কিংবা অংশীদার সাব্যস্ত করা।

---

[১] ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করাকে 'ইবাদাতের শিরক' বলা হয়। ইবাদাতের অর্থ প্রগাঢ় ভয় ও আশা মিশ্রিত চূড়ান্ত ভক্তি—বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করা। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি এরূপ ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশই শিরক! দেখুন— ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রচিত 'ইসলামী আকিদা': পৃষ্ঠা ৩৭২— অনুবাদক

আর কেনই বা শিরক সবচে বড় পাপ ও অবাধ্যতা হবে না! যিনি তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনলেন, অগণিত নিয়ামতে ডুবিয়ে রাখলেন—তাঁর ইবাদাতে, শুকরিয়া জ্ঞাপনে কিনা অন্য কাউকে অংশীদার করছে!

শিরক তিন ভাগে বিভক্ত

১) বড় শিরক। (شرك اكبر)

২) ছোট শিরক। (شرك اصغر)

৩) অস্পষ্ট শিরক। (شرك خفي)

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (ﷺ) বলেন, “শিরক মূলত দুই প্রকার: ক) বড় শিরক, খ) ছোট শিরক”

প্রথম বিষয়: বড় শিরক (شرك أكبر)

তাওবাহ ছাড়া বড় শিরক আল্লাহ ক্ষমা করেন না। যদি কেউ এই শিরক নিয়ে মারা যায়, পরকালে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়—তাহলে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। অনন্তকাল তাতে দগ্ধ হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরিক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল।” (সূরাহ নিসা ৪:৪৮)

তিনি ইরশাদ করেন,

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ

“আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সাথে শরিক না করে। যে কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল, আর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে ছুঁড়ে ফেলে দিল।” (সূরাহ হজ্জ ২২:৩১)

এ কারণেই মাজার, মূর্তি ও অন্যান্য সব বস্তু পূজারী[২] মুশরিকরা জাহান্নামে তাদের উপাস্যকে বলবে,

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্য স্পষ্ট গুমরাহীতে ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে সর্বজগতের পালনকর্তার সমকক্ষ স্থির করতাম।" (সূরাহ শুআরা ২৬ : ৯৭-৯৮)

তারা কিন্তু আল্লাহর সাথে স্রষ্টা, রিযিকদাতা, জীবন-মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক হিসেবে তাদেরকে শরিক সাব্যস্ত করেনি। তারা আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করেছে ভালোবাসার ক্ষেত্রে—যে ভালোবাসাটা ইবাদাতের মগজ। অনুরূপভাবে তারা আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করেছে বড়ত্ব প্রকাশে, সম্মান প্রদানে—যে বড়ত্ব ও সম্মান তাঁর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত সমূহের অন্যতম একটি ইবাদাত। এ কারণেই আল্লাহ সেসকল লোকদের নিন্দা করেছেন, যারা তাঁর বড়ত্ব প্রকাশ করে না। তাকে সম্মান দেয় না। তিনি বলেন,

مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

"তোমাদের হলো কী যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করছ?" (সূরাহ নূহ ৭১:১৩)

অর্থাৎ বড়ত্ব ও সম্মান।

একারণেই আমরা বলি, সকল প্রকার অনিষ্টই আল্লাহর সাথে শিরক করার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। বড় শিরক (شرك اكبر) এর অনেক প্রকার রয়েছে। তবে মৌলিকভাবে তা চার প্রকার।[৩] আমরা এখন সেটা সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব, যাতে আলোচনা দীর্ঘ না হয়। যদিও বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। এবং এটাই উচিৎ ছিল। কিন্তু আমাদের অনীহা ও সংকল্পের কমতি, ধৈর্যের ঘাটতির কারণে অল্প আলোচনায় যতটুকু উপকৃত হওয়া যায়, তাই শ্রেয়।

---

[২] মাজারপূজারী দ্বারা ঐ সব লোক উদ্দেশ্য, যারা মাজারওয়ালাকে সিজদাহ করে, মাজারওয়ালার নামে মান্নত মানে, তার নামে কুরবানি করে, ভালমন্দ পৌঁছানোর শক্তি রাখে অথবা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে মধ্যস্থতা হিসেবে বিশ্বাস করে, কিংবা এমন কিছু তার নিকট প্রার্থনা করে, যা প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই আছে। তবে যারা সহিহ পদ্ধতিতে যিয়ারত করেন, তারা এর আওতাভুক্ত নন। বিস্তারিত দেখুন ইসলামী আকিদা, পৃষ্ঠা: ৩৯৩, শাহ ওয়ালি উল্লাহ রচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ', খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৩— অনুবাদক

[৩] মাজমু'আতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা-৫

প্রথম প্রকার (شرك الدعوة)

আল্লাহকে আহবান করার ক্ষেত্রে শিরক করা। দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী,

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

> "তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একনিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন তারা আল্লাহর সাথে শরিক করে বসে।" (সূরাহ আনকাবুত ২৯:৬৫)

লেখক তার *"কাওয়াইদুল আরবা'আ"* নামকে গ্রন্থে বলেন, "চতুর্থ কায়েদা বা মূলনীতি হলো, বর্তমান সময়ের মুশরিকরা আগের যুগের মুশরিকদের চেয়ে জঘন্য! তাদের শিরক আরও মারাত্মক! কেননা পূর্বযুগের মুশরিকরা শিরক করত সুখের সময়। স্বাচ্ছন্দে থাকাকালে। আর বিপদে পড়ে গেলে আল্লাহকে ডাকতো। কিন্তু বর্তমানের শিরককারীরা না সুখের সময় আল্লাহকে ডাকে—না দুর্যোগে পড়ে!"

একই কিতাবের ভূমিকায় তিনি বলেন, "যখন ইবাদাতে শিরক ঢুকে যায়, তখন তা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ওযু ভঙ্গের কারণ প্রকাশ পেলে অযু নষ্ট হয়ে যায়। যদি আমরা বুঝে থাকি যে, শিরক ইবাদাতকে নষ্ট করে দেয়, আমাদের সকল আমল বরবাদ করে দেয়, শিরকের কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হতে হবে—তাহলে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো শিরক সম্পর্কে জানা আমাদের জন্যে কতটা জরুরি। যাতে আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে ভয়ানক 'ফাঁদ' থেকে মুক্ত রাখেন। আর এই ভয়ানক ফাঁদ হলো—আল্লাহর সাথে শিরক করা।"

দ্বিতীয় প্রকার (شرك النية و الإرادة و القصد)

ইচ্ছা, সংকল্প ও নিয়্যাতের মধ্যে শিরক করা। দলিল হলো,

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

> "যারা এ দুনিয়ার জীবন আর তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে, তাদেরকে এখানে তাদের কর্মের পুরোপুরি ফল আমি দিয়ে দেই, আর তাতে তাদের প্রতি

কোন কমতি করা হয় না। কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নাই, এখানে যা কিছু তারা করেছে তা নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে।" (সূরাহ হূদ ১১:১৫-১৬)

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেন,

"নিয়্যাত ও ইচ্ছের মধ্যে শিরক; এটা তো কূলকিনারাহীন দরিয়া। খুব কম মানুষই এই শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি তার কোনো আমল দ্বারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সন্তুষ্টি কামনা করল, অন্যের নৈকট্য প্রার্থনা করল, প্রতিদানের আশা রাখল—তাহলে সে তার নিয়্যাত ও সংকল্পে শিরক করল।"

লেখক রাহিমাহুল্লাহ নিয়তের শিরককে বড় শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, অর্থাৎ যেই আমল দ্বারা গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা উদ্দেশ্য হয়।[৪] আর রিয়া তথা লোক দেখানো ইবাদাত, এটা ছোট শিরক। ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই তার সুস্পষ্ট আলোচনা আসছে।

তৃতীয় প্রকার (شرك الطاعة)

আনুগত্যে শিরক।

আল্লাহর অবাধ্যতা করে বরং কথিত পীর, বুজুর্গ, শাইখ ও ধর্মীয় পণ্ডিতদের আনুগত্য করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের 'আলিম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে; আর মারইয়াম-পুত্র মাসীহ্‌কেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, পবিত্রতা আর মহিমা তাঁরই, বহু উর্ধ্বে তিনি তারা যাদেরকে তাঁর অংশীদার গণ্য করে থাকে।" (সূরাহ তাওবা ৯:৩১)

[৪] গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, অর্থাৎ দ্বীনি কাজে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু মানুষকে খুশি করার জন্য কোনো ইবাদাত করা।—অনুবাদক

ইমাম তিরমিযি সহ আরও অনেকে এই আয়াতের তাফসীরে বিখ্যাত সাহাবি আদি ইবনু হাতিম ﵁-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “একবার রাসূল ﷺ এই আয়াতটি পড়লেন,

اتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের ‘আলিম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে; আর মারইয়াম-পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, পবিত্রতা আর মহিমা তাঁরই, বহু উর্ধ্বে তিনি তারা যাদেরকে তাঁর অংশীদার গণ্য করে থাকে।” (সূরাহ তাওবাহ ৯:৩১)

আমি বললাম, “আমরা তো তাদের ইবাদাত করি না।” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তারা তোমাদের জন্য কোন কিছু হালাল করলে তোমরা সেটাকে হালাল, আর কোন কিছুকে হারাম করলে তোমরা সেটাকে হারাম হিসাবে কি গ্রহণ করছো না?” আমি বললাম, “জী, অবশ্যই।” তিনি বললেন, “এটাই তাদের ইবাদাত।”[৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ বলেন,

“এ সকল লোক, যারা সংসার বিরাগী, পাদ্রী ও আলিমদের ‘প্রভু’ হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম, আর যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল বলা সত্ত্বেও তাদের অনুসরণ করে, তাদের মাঝে দুইটা ভাগ আছে।

১) অনুসারীরা জানে যে তাদের এই গুরুজি আল্লাহর বিধানকে বিকৃত করছে, তথাপি তাদের অনুসরণ করে। এবং সে অনুযায়ী তারা আল্লাহ কর্তৃক হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল হিসেবে বিশ্বাস করে, নেতাদের আনুগত্য করে; তাদের এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যে—এরা আল্লাহর দ্বীনের উল্টোটা করছে, তাহলে

---

[৫] তিরমিযি—৩০৯৫, হাদীসটির সনদ দুর্বল। তবে ইবনু জারীর (৫/২৫৯)—এ মওকুফ সনদে আলোচ্য হাদীসের শাহিদ তথা সমার্থক হাদীস এনেছেন, যা হযরত হুযায়ফা ﵁ থেকে আবী বুখতার, তাঁর কাছ থেকে হাবীব বিন আবী ছাবিত বর্ণনা করেছেন। এই সনদটিও সহিহ হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নমুক্ত নয়। কিন্তু আলোচ্য হাদীসটি এই আয়াতের তাফসীর হিসেবে সকল মুফাসসিরের নিকট অত্যাধিক প্রসিদ্ধ। কেউ তা বিবর্জনযোগ্য বা অনুল্লেখ্য মনে করেননি।

এটা কুফরি। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে শিরক করল[৬]। যদিও তারা তাদের জন্য সালাত না পড়ে, তাদের সিজদাহ না করে। সুতরাং যে

ব্যক্তি এই জ্ঞান রাখে যে—এটা শরীয়ত বিরোধী, তথাপি সে ব্যাপারে কারো অনুসরণ করে, এবং এই বিশ্বাস রাখে যে—'গুরুজি' যা বলছে, যা করছে, তাই সঠিক, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ যা বলেছেন, তা সঠিক নয়, তাহলে সেও এই আয়াতে উল্লেখিত মুশরিকদের মতই মুশরিক হয়ে গেল।

২) যারা হারামকে হারাম আর হালালকে হালাল বলেই বিশ্বাস করে, আকিদা রাখে, তবুও আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের অনুসরণ করে, যেমন আজকাল বহু মুসলিম এমনটি করছে, অথচ তারা জানে যে এটা গুনাহ। তো তাদের বিধান হলো গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির মত।”[৭]

চতুর্থ প্রকারঃ (شرك المحبة)

ভালোবাসার মাঝে শিরক করা।

দলিল হলো,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

“আর কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। আর কতইনা উত্তম হতো যদি এ যালিমরা পার্থিব কোনো কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।” (সূরাহ বাক্বারাহ ২:১৬৫)

আমরা সচরাচর দেখে থাকি, প্রতিপালক সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আল্লাহকে যেভাবে যতটা মুহাব্বাত করা উচিৎ—মুশরিকরা মূর্তি, দেবদেবী ও অন্যান্য উপাস্যদের ঠিক সেভাবেই মুহাব্বাত করে। কখনো তার চেয়েও বেশি। আমরা খেয়াল করলে বুঝতে পারবো, আল্লাহর শানে কটূক্তি করায় যেভাবে ক্রোধান্বিত

---

[৬] রাসূলের সাথে শিরক মানে রাসূলের মতই অন্য কাউকে শরীয়ত প্রণেতা মনে করা—অনুবাদক

[৭] মাজমু'আতুল ফাতাওয়া, ৭/৭০

হওয়া উচিৎ—এসব লোকেরা মূর্তির অপমানে সেরকম আর সেভাবেই ক্রোধান্বিত হয়। তারা তাদের ভ্রান্ত ইলাহের প্রসঙ্গে যতটা উৎফুল্ল হয়, আল্লাহর ব্যাপারে অতটা হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

"এক আল্লাহর উল্লেখ করা হলেই যারা কিয়ামতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের উল্লেখ করা হলেই তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়।" (সূরাহ যুমার ৩৯:৪৫)

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেন

"এখানে এসে মুহাব্বাত চারটি প্রকারে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক প্রকারের পার্থক্যগুলো জানা আবশ্যক। অনেক বিভ্রান্তকারী বিভ্রান্ত হয়েছে পার্থক্যগুলো বুঝতে না পারার কারণে।

১) আল্লাহকে ভালোবাসা (حب الله), তাঁকে মুহাব্বাত করা। আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি এবং চির সফলতা অর্জনে শুধুমাত্র তাঁকেই ভালোবাসাটা যথেষ্ট নয়। কেননা মুশরিক, ইহুদি, ক্রুশপূজারী এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আল্লাহকে ভালবাসে।

২) محبة ما يحب الله অর্থাৎ আল্লাহকে ভালোবাসার পাশাপাশি আল্লাহ যা ভালোবাসেন সেগুলোকেও ভালোবাসা। মহাব্বত করা। এটাই সেই ভালোবাসা— যার কারণে একজন মানুষ পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। বেরিয়ে আসে কুফরির ঘোর অন্ধকার থেকে। যে যত বেশি এই ভালবাসায় অগ্রগামী ও কঠোর হবে—আল্লাহর নিকট সে তত বেশি প্রিয় হবে।

৩) الحب له و فيه অর্থাৎ কাউকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় মুহাব্বাত করা। এটা আসলে দ্বিতীয় প্রকারেরই অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। এটি ছাড়া দ্বিতীয় প্রকারটিতে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

৪) (الحب مع الله) অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে ভালোবাসা। তাঁর মহাব্বতের মাঝে অন্যকে শরিক করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো জিনিসকে ভালোবাসে—আল্লাহ ভালোবাসেন সে জন্য নয়, আল্লাহর জন্যে নয়, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের আশায় নয়—তবু এমন কিছুকে আল্লাহর ভালোবাসায় শরিক করল—সে তো আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করল। আল্লাহর

মতোই ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত কিছু আছে, তা বিশ্বাস করল। আর এটাই মুশরিকদের মহাব্বত।”[৮]

এই হলো বড় শিরকের চারটি প্রকার *(অর্থাৎ বড় শিরকের চারটি প্রকার যা এতক্ষণ ধরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)* এই চারটির প্রত্যেকটির দ্বারাই একজন মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। কেননা এগুলো নিরেট ইবাদাত। কোনো ইবাদাতকে গাইরুল্লাহর দিকে ফিরানো, গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদাত করা— সম্পূর্ণরূপে শিরক। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন,

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِۦٓ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَٰفِرُونَ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহকেও ডাকে, এ ব্যাপারে তার কাছে কোনো দলিল প্রমাণ নেই, একমাত্র তার প্রতিপালকের কাছেই তার হিসাব হবে, কাফিরগণ অবশ্যই সফলকাম হবে না।” (সূরাহ মুমিন ২৩:১১৭)

আল্লাহ নিজেই তাদের নাম রেখেছেনন ‘কাফির’ বলে। আল্লাহকে ডাকার (ইবাদাত) সময় তাতে অন্য কাউকে শরিক রাখার কারণে।

আরও কিছু বিষয় রয়েছে, যা বড় শিরক।

গাইরুল্লাহর নামে পশু জবাই করা।[১]

আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে পশু জবাই করা বড় শিরক। কেননা পশু কুরবানি করার মাধ্যমে মূলত বান্দা আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য অর্জন করে। এবং এটা একটি ইবাদাতও। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

“কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর।” (সূরাহ কাউছার ১০৮:২)

তিনি অন্যত্র বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ

“বল, আমার সালাত, আমার যাবতীয় ‘ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ সব কিছুই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।” (সূরাহ আনআম ৬:১৬২)

---

[৮] “ভালোবাসার মাঝে শিরক করা” বলার দ্বারা এই প্রকারটিই উদ্দেশ্য।

[১] কিংবা গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করে— অনুবাদক

আর এখানে কুরবানি (نسك) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পশু জবাই করা। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন পীর-বুজুর্গের নামে, মূর্তি কিংবা জিনের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে—যেমনটা দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশের অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি এবং মক্কার আশেপাশে বিশেষ কিছু এলাকার লোকেরা করে থাকে—তাহলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।[১০] এবং কুফরির চক্করে পড়ে যাবে। পথভ্রষ্ট হবে। কেননা সে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে গাইরুল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে।

গাইরুল্লাহর জন্য মান্নত করা।

এটাও একটি বড় শিরক। কেননা মান্নত মানা একটি ইবাদত। যেমন আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

"যারা মান্নত পূরণ করে আর সেই দিনকে ভয় করে যার অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।" (সূরাহ দাহর ৭৬:৭)

তিনি আরও বলেন,

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"যারা আল্লাহর সঙ্গে সুদৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার নির্দেশ আল্লাহ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:২৭)

সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো পীর, বুজুর্গের নামে মোমবাতি, পশু কোরবানি অথবা কোন জিনিসের মান্নত করবে, তাহলে সে যেন তার ঘাড় থেকে ইসলামের বন্ধনকে খুলে ফেলে দিল। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মান্নত করা জায়েজ নেই। এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য মান্নত মানা মানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত দ্বীনকে অস্বীকার করা। ত্রুটিপূর্ণ মনে করা। যেমনটা প্রতিবেশী দেশ ও অন্যান্য অনেক দেশে মাজার পূজারীরা করে থাকে। তাদের বিশ্বাস—এতে তাদের উপকার হবে—অনিষ্ট দূর হবে। আর এটা বড় শিরক—যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।[১১]

---

[১০] অর্থাৎ পশু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম না নিয়ে গাইরুল্লাহর নাম নেয়া।— অনুবাদক

[১১] মাজারপন্থী বা মাজারে আগত লোকেরা বিভিন্ন কুফরি ও শিরকি ধারণা পোষণ করে। যেমন মাজারে শায়িত ব্যক্তিকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করা; হাজত পূরণকারী, বালা-

অতএব, যে ব্যক্তি বলবে এটা ছোট শিরক, তাহলে সে যে বিষয়ে অজ্ঞ, সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বনের পথ থেকে অনেক দূরে রয়েছে। আল্লাহ ﷻ-ই আমাদের সাহায্যকারী, ভরসাস্থল। এবং আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি বা সাহায্য নেই।

আরও একটি বড় শিরক হলো আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো কাছে আশ্রয় চাওয়া। সাহায্য প্রার্থনা করা।[১২] মোট কথা এমন প্রতিটি বিষয়, যা কেবল আল্লাহর একক নিয়ন্ত্রণে—তা গাইরুল্লাহর দিকে ফেরানোই শিরক।

মুসিবত থেকে উদ্ধারকারী এবং মানুষের উপকার-অপকারের মালিক মনে করা ইত্যাদি। এসকল শিরকি বিশ্বাস থেকে তারা বিভিন্ন শিরকি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। যেমন— মাজারের নামে মান্নত করা, মাজারে এসে সিজদা করা, পশু জবাই করা, মাজারওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে রোনাযারি করা এবং মাল-দৌলত, সন্তান-সন্ততি, সুস্থতা ও সচ্ছলতা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এভাবে বিশ্বাসের শিরক মানুষকে কর্মের শিরকের মাঝেও লিপ্ত করে দেয়।

অতএব কেউ যদি গায়রুল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য সিজদা করে, গায়রুল্লাহর নামে কুরবানি করে, গায়রুল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার নাম জপতপ করে, মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বের কোনো বিষয় গায়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, কোনো মাজার বা দরগাহ্‌র উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহর মতো তীর্থযাত্রা করে, হারাম শরীফের মতো দরগাহ ও তার চারপাশের অঞ্চলকে তীর্থস্থান মনে করে, মাজার-দরগাহর তওয়াফ করে এবং দরগাহর দেয়ালে ভক্তিভরে চুম্বন করে—মোটকথা যেসব কাজ আল্লাহ তাআলা তাঁর উপাসনার জন্য নির্ধারণ করেছেন তা গায়রুল্লাহর জন্য করে—তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ শিরক। এবং সে ব্যক্তি হবে মুশরিক।

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا إِلَى ضَرَائِحِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ

وقال ابن عابدين الشامي) :قوله باطل وحرام (بوجوه، منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، وَمِنْهَا أَنَّ الْمَنْذُورَ لَهُ مَيِّتٌ وَالْمَيِّتُ لَا يَمْلِكُ .وَمِنْهُ أَنَّهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللهِ تَعَالَى وَاعْتِقَادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ.

(সূত্র: রদ্দুল মুহতার, অধ্যায়: 'সওম', খন্ড: ২, পৃষ্ঠা ৪৩৯, আলবাহরুর রায়েক: ২/২৯৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩/৫, সূরা আ'রাফ: ৫৪, সূরা ফাতির: ১৩, সূরা সাবা: ২২, সূরা রুম: ৪০, সূরা শূরা: ৪৯-৫০, সূরা যুমার: ৩৮, তাফসীরে আহমদিয়া: পৃষ্ঠা ৬০৪-৬০৫, ইসলামী আকিদা: ৩৯৩)— অনুবাদক

[১২] এখানে আশ্রয় আর সাহায্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন সাহায্য এবং আশ্রয়, যা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে, এবং তা কেবল আল্লাহর দ্বারাই সম্ভব। তিনি ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে সম্ভব নয়। যেমন, শয়তান থেকে, বালা-মুসিবত, দুর্যোগ-দুর্ভোগ, রোগবালাই থেকে, যুদ্ধের ময়দানে বিজয় ইত্যাদি বিষয়ে গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য কিংবা আশ্রয় চাওয়া হলে সেটা শিরক হিসেবে গণ্য হবে। দেখুন- ইসলামী আকিদা, পৃষ্ঠা ৪০০— অনুবাদক

দ্বিতীয় বিষয়: ছোট শিরক। (الشرك الأصغر)

কোন ব্যক্তি যদি এই প্রকার শিরকে লিপ্ত থাকে, এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হয়, আর হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে এই শিরক নিয়ে দণ্ডায়মান হয়—তাহলে বিশুদ্ধতম অভিমত অনুযায়ী এ ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। চাইলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন—কিংবা চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন। তবে তার সর্বশেষ চিরস্থায়ী আবাসস্থল অবশ্যই জান্নাত। কেননা ছোট শিরককারী ব্যক্তি জাহান্নামে স্থায়ী হবে না। কিন্তু হ্যাঁ, এ ব্যাপারে অসংখ্য ওয়ীদ এবং সতর্কবার্তা এসেছে। সুতরাং এ থেকে বাঁচাও অপরিহার্য।

ছোট শিরকের কিছু প্রকার

১) গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম করা। তবে যদি কসম দ্বারা ঐ ব্যক্তি বা বস্তুর সম্মান কিংবা তা'জীম করা উদ্দেশ্য না হয়—অন্যথায় এটা শিরকে আকবর তথা বড় শিরক হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল, সে হয় কুফুরি করল কিংবা শিরক করল।"[১৩]

হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷫, ইমাম আবু দাউদ ﷫, তিরমিযি ﷫ ও হাকিম ﷫ বর্ণনা করেছেন। হাকিম ﷫ হাদীসটিকে সহিহ বলেছেন। তিনি বলেন, "এই হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারি ও মুসলিম এর শর্তানুপাতে হয়েছে। তবে আল্লামা যাহাবি ইবনু উমার ؓ থেকে বর্ণিত এই হাদীসের সনদে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।"

২) রিয়া তথা লোকদেখানো ইবাদাত এবং মাখলুকের জন্য আমল করা। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আমি তোমাদের ব্যাপারে সর্বাধিক বেশি আশঙ্কা করছি ছোট শিরকের।" জিজ্ঞেস করা হলো, ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, "রিয়া তথা লোকদেখানো ইবাদাত!"[১৪]

হাদীসটি ইমাম আহমাদ সহ আরও অনেকেই মুহাম্মাদ বিন লাবীদ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদটি হাসান পর্যায়ের।

---

[১৩] আবু দাউদ-৩২১৫, তিরমিযি-১৫৩৫, মুসনাদে আহমাদ-৬০৭২, ইবনু হিব্বান-৪৩৫৯
[১৪] আত তারগীব ওয়াত তারহীব-১/৫২, হাইসামি এর মাজমাউয যাওয়াইদ-১০/২২৫, বুলুগুল মারাম-৪৪০, মুসনাদে আহমাদ-২৩৬৮০

সাহাবাগণ রাসূল ﷺ-কে দেখেছেন। তাঁর মজলিশে বসেছেন। তাঁর সঙ্গ পেয়েছেন। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনে মনঃপ্রাণ জুড়িয়েছেন। অতিবাহিত করেছেন ওহী অবতরণের পবিত্র যুগ। সেই সাহাবাগণের উপর যদি ছোট শিরক আশঙ্কার কারণ হয়—তাহলে আমাদের ব্যাপারে কেমন আশঙ্কা হওয়ার কথা—যারা রাসূলের যুগ পাইনি—রাসূলকে দেখিনি। আবার আমাদের ইলম কম! ঈমানও দুর্বল!

রাসূল ﷺ -এর একনিষ্ঠ অনুসরণ এবং ﷻ-এর প্রতি বিশুদ্ধ নিয়্যাত অবলম্বন ছাড়া কোন মুসলিমের পক্ষেই এ শিরক থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ؒ সূর্য, মাজার, অগ্নি ও অন্যান্য বস্তু পূজারীদের আলোচনা করার পর উল্লেখ করেছেন, "ইবাদতের মধ্যে শিরক করা—শিরকের যত প্রকার রয়েছে তন্মধ্যে অধিক সহজাত।"

বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম। মানুষ বিশ্বাস করে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। কোনো ইলাহ নেই। এবং সে তার ঘোষণাও দেয়। সে মানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন জিনিস অনিষ্ট, উপকার, দান কিংবা বাধাদানের অধিকার রাখে না। তিনি ছাড়া ইবাদাতের উপযুক্ত কোন সত্তা নেই। কোন প্রতিপালক নেই। তথাপি সে তার চলাফেরা, ইবাদতকে স্রেফ আল্লাহর জন্য করতে পারে না। বরং সে ইবাদত করে নিজের জন্য, দুনিয়া কামানোর জন্য—মাখলুকের কাছে সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব বৃদ্ধির জন্য। তার ইবাদাতে আল্লাহর জন্য অংশ থাকে, অংশ থাকে তার নিজের জন্যও। নফসের জন্য কিছু অংশে থাকে, থাকে শয়তান ও মাখলুকের জন্যেও। অধিকাংশ মানুষেরই আজ এই অবস্থা।

এই প্রকার শিরকের ব্যাপারে ইবনু হিব্বান ؒ তাঁর সহিহতে উল্লেখ করেছেন, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন,

"সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই উম্মাতের জন্য শিরক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। সাহাবাগণ আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ থেকে বাঁচার উপায় কী?' তিনি বলেন, 'তোমরা পাঠ করো,

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

"হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই।"[১৫]

আল্লাহ ﷻ বলেন,

---

[১৫] আদাবুল মুফরাদ-৭২১, ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহর 'মাযরূহীন'- ২/৪৮৩ ও ৩/১৩০

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

তুমি বলে দাও, 'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার নিকট এই মর্মে ওহী আসে যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ 'আমাল করে আর তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতে কাউকে শরিক না করে।' (সূরাহ কাহাফ ১৮:১১০)

অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ যেমন একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই—অনুরূপভাবে উচিত হলো যেকোনো ইবাদত একমাত্র তাঁর জন্যই করা। উপাস্য হিসেবে তিনি যেমন একক—ইবাদাতের ক্ষেত্রেও একক হওয়া আবশ্যক। আর সৎকাজ (আমালে সালিহ) তো সেটাই—যেটা রিয়া মুক্ত—সুন্নাহ দ্বারা সজ্জিত।

উমার ইবনু খাত্তাব ﵁-এর বিশেষ একটি দু'আ ছিল,

اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا.

"হে আল্লাহ! আপনি আমার ইবাদাতকে সালেহ তথা বিশুদ্ধ করুন। শুধু আপনার সন্তুষ্টির কারণ বানান। এবং তাতে অন্য কারো অংশীদারিত্ব রাখবেন না।"[১৬]

এই ধরনের শিরক ইবাদাতের সাওয়াবকে বরবাদ করে দেয়। কখনও এর জন্য পাকড়াও করা হয়ে থাকে—যখন আমলটি অপরিহার্য তথা ওয়াজিব হবে। তবে যে ব্যক্তি আমলটি একদমই করেনি তার অবস্থান আরও নিচে। মানুষ শাস্তির উপযুক্ত হয় আল্লাহর আদেশ ছেড়ে দেওয়ার কারণে। আর আল্লাহ ﷻ আদেশ করেছেন, ইবাদাতকে যেন ভেজাল মুক্ত রাখা হয়। তিনি ইরশাদ করেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

"তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোনো হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে।" (সূরাহ বাইয়্যিনাহ ৯৮: ৫)

সুতরাং যে ব্যক্তি তার ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য করেনি, ভেজাল মুক্ত রাখেনি—সে মূলত আল্লাহর আদেশকে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বরং যা

---

[১৬] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল তার কিতাবুয যুহদে এটা উল্লেখ করেছেন হাসান ইবনু উমার এর বরাতে। কিন্তু তিনি তাঁর থেকে তা শুনেননি।

তাকে আদেশ করা হয়নি এমন বিষয়ের সাথে সে নিজেকে যুক্ত করেছে। সুতরাং তার ইবাদত অশুদ্ধ এবং তা গৃহীত হবার অনুপযুক্ত।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

"আমি শরিক মুক্ত! যে ব্যক্তি ইবাদতের মধ্যে আমার সাথে অন্য কিছুকে শরিক করবে সেটা তার ঐ শরিককৃত সত্ত্বার জন্য, আমি তা থেকে মুক্ত। আমি পবিত্র!"[১৭]

এই প্রকার শিরক 'ক্ষমাযোগ্য' এবং 'ক্ষমাযোগ্য নয়' এরকম দু'টি ভাগে বিভক্ত।

যে ইবাদাত স্রেফ আল্লাহর জন্য হয় না, তার দুই অবস্থা:

১) যখন ইবাদাতের মধ্যে রিয়া তথা লোক দেখানোটাই মূখ্য। মানুষের মন জয় কিংবা দুনিয়া অর্জনই কেবল উদ্দেশ্য। যেমন—মুনাফিকরা! তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন,

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاۤءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا

"নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন এবং তারা যখন সলাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যভরে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে।" (সূরাহ নিসা ৪:১৪২)

এই প্রকারের আমল বরবাদ হওয়ার ব্যাপারে কোন মুসলিমেরই সন্দেহ থাকার কথা নয়। বরং এই ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর কঠিন শাস্তির উপযুক্ত।

২) আমলটি আল্লাহর জন্যই করা। কিন্তু তাতে রিয়া ঢুকে যায়। তাহলে এর আবার দুই অবস্থা:

ক) রিয়াটা ইবাদাতের মূল বা সূচনাতেই যুক্ত থাকবে।

খ) কিংবা রিয়াটা ইবাদাতের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ চলে আসবে।

প্রথম প্রকারের হলে তার আমল বাতিল। গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীস দ্বারাই তা প্রমাণিত। হাদীসটি সহিহ মুসলিমে এসেছে। আবু হুরায়রা ﵁-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন,

[১৭] সহিহ মুসলিম- ২৯৮৫, ইবনু মাজাহ- ৪২০২

"শিরক এর শরীকানা থেকে আমি অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি তার আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে আমি তাকে এবং তার শরিককৃত বস্তুকে বর্জন করি।"

আর দ্বিতীয় প্রকারের রিয়া, অর্থাৎ লোকদেখানো ভাবটা যদি হঠাৎ হঠাৎ চলে আসে, আর এ অবস্থা দীর্ঘ হয়—তাহলে কতক আলিমের মতে তার আমল বাতিল। আর কতক আলিম বলেন, যদি অবস্থাটা দীর্ঘ হয়—তাহলে ইখলাস অনুযায়ী সাওয়াব পাবে। এবং রিয়া অনুযায়ী শাস্তি হবে। তবে শর্ত হলো সে যদি তা থেকে বাঁচতে, এবং তা দূর করতে যথেষ্ট চেষ্টা করে। এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহর বাণী,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

"আর যে লোক তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছিল এবং নিজেকে কামনা বাসনা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিল, জান্নাতই হবে তার বাসস্থান।" (সূরাহ নাযিয়াত ৭৯:৪০-৪১)

উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল, আর তার নিয়্যাত ছিল গনিমতের মাল করায়ত্ত করা। এমন ব্যক্তির আমলের ব্যাপারে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ তাঁর *'ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন'* নামক গ্রন্থের ২ নং খন্ডের ১৬৩ নং পৃষ্ঠায় পূর্বোক্ত কথা উল্লেখ করার পর বলেন,

> "এটা হলো ঐ ব্যক্তির মত, যে বিনিময়ের চুক্তিতে সালাত পড়ে। সুতরাং যদি সে বিনিময় নাও নিত, তবু সে সালাত পড়ত। কিন্তু তা হতো আল্লাহর জন্য এবং বিনিময় নেওয়ার জন্যও।
>
> এটা হল ঐ ব্যক্তির মত যে হজ্ব করে—যাতে করে ফরযিয়্যাতের দায়িত্ব আদায় হয় এবং লোকে তাকে 'হাজী' বলে।
>
> অনুরূপভাবে যাকাত দেয়—যাতে যাকাতের ফরযিয়্যাত আদায় হয় এবং মানুষও তাকে দানশীল বলে! এমন সব ব্যক্তির আমল গ্রহণ করা হয় না।"

আর আল্লামা ইবনু রজব ﷺ বলেন, "এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে জিহাদের যে প্রতিদান রয়েছে, সেখানে সমস্যা হবে। প্রতিদানে কমতি হবে। কিন্তু পুরো আমলটা বাতিল হয়ে যাবে না।"

ইবনু রজব ؒ তাঁর *'জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম'* নামক গ্রন্থের ১৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন,

> "...আমরা ইতিপূর্বে যে হাদিস সমূহ বর্ণনা করেছি, তা প্রমাণ করে—যে ব্যক্তি জিহাদ দ্বারা দুনিয়া কামাতে চায়—তার কোন সাওয়াব নেই। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে—ব্যক্তির জিহাদ দ্বারা কেবল দুনিয়াই উদ্দেশ্য হয়।"

এর উপর ভিত্তি করেই নিম্নোক্ত মাস'আলা দুটিতে পার্থক্য গড়ে উঠে।

১) যে ব্যক্তি সাওয়াব এবং সুনামের জন্য জিহাদ করে।

২) যে ব্যক্তি সাওয়াব এবং গনিমতের জন্য জিহাদ করে।

প্রথম মাস'আলার প্রমাণে আবু উমামার হাদীস রয়েছে—যা ইমাম নাসায়ী হাসান সনদে উল্লেখ করেছেন।

> جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَالَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»: لَا شَيْءَ لَهُ «فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»: لَا شَيْءَ لَهُ «ثُمَّ قَالَ»: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ«
>
> "এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি সওয়াব এবং সুনামের জন্য জিহাদ করে—তার জন্য কী রয়েছে?' রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'তার জন্য কিছুই নেই। সে ব্যক্তি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে (একটি কথাই) বললেন, 'তার জন্য কিছুই নেই।' তারপর রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ্ তাঁর জন্য করা খাঁটি (একনিষ্ঠ) আমল ব্যতীত, যা দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না হয়, আর কিছুই কবুল করেন না।"[১৮]

দ্বিতীয় মাস'আলা নিয়ে আলোচনা তো আমরা একটু আগেই করে এসেছি। অর্থাৎ যদি কেউ সাওয়াব ও গনিমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, তাহলে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমের মতে তার জিহাদ তথা আমল কবুল হবে না। আর ইবনু রজবের মতে পুরো আমল বরবাদ হবে না, তবে আমলটা ত্রুটিপূর্ণ হবে। সাওয়াব কম হবে।

আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

---

[১৮] নাসাঈ—৩১৪০

ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে অন্য কাউকে মাধ্যম বানানো

লেখক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﵀ বলেন,

"…. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার মাঝে কাউকে মধ্যস্থ মানবে, তাদের ডাকবে, তাদের কাছে প্রার্থনা করবে, তাদের উপর আস্থা রাখবে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির"…

আমি বলি—ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। মানুষের মাঝে এর ভয়াবহতা গুরুতর এবং ব্যাপক। কেননা অনেক মানুষ নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে, অথচ সে ইসলাম কী তা-ই জানে না। ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। তার ও রাব্বে কারীমের মাঝে কিছু মধ্যস্থতাকারী মান্য করে। তাদের কাছে দুঃখ দূর করন, আক্ষেপ ঘোচন, সংকট নিরসন কামনা করে। সকল ইমাম ও আলিমের মতে এমন ব্যক্তি কাফির! কেননা আল্লাহ তা'আলা যত আসমানি কিতাব এবং নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেকের একটি উদ্দেশ্য—যাতে মানুষ একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করে। তার কাছেই প্রার্থনা করে। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করে। কিন্তু এ সকল মাজার পুজারীরা তা মানতে নারাজ। তারা তা অস্বীকার করে। মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করে। সেই সকল মধ্যস্থতাকারীর কাছে নিজেদের উপকার কামনা এবং বিপদ দূর করন ও সমস্যার সমাধান চায়। তারা এমনটা করে ইবাদাত হিসেবে। যা আল্লাহ আদেশ করেননি। আর যদি কেউ তাদের এ সকল বিষয়কে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে, তখন তারা 'সালেহীন, আউলিয়া ও পীর-বুযুর্গের প্রতি সম্মান নেই, ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই, এরা বেয়াদব, এরা ইসলামের শত্রু" ইত্যাদি বলে অপবাদ আরওপ করে!

তাদের ভ্রান্ত ধারণা হলো—আল্লাহর সম্মান, মর্তবা ও মর্যাদা এত বেশি যে—সরাসরি বান্দা তাঁর কাছে চাইতে পারবে না। সুতরাং এমন একজনকে মধ্যস্থতাকারী বানানো আবশ্যক—যে তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে চাইবে। তাদের কথা আল্লাহকে বলবে। যেমন দুনিয়ার বাদশাহরা! তাদের কাছে সাধারণ প্রজা সরাসরি কিছু চাইতে পারে না। কোন মাধ্যম ছাড়া, মধ্যস্থতাকারী ছাড়া তা কল্পনাও করা যায় না। আর আল্লাহ ﷻ তো দুনিয়ার এসকল রাজাদের চেয়ে অনেক বড়। অনেক বেশি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী!

আল্লাহ হেফাজত করুন! তারা আল্লাহ ﷻ-কে অক্ষম, অপদার্থ মাখলুকের সাথে তুলনা করছে। যারাই এই দরজায় প্রবেশ করেছে, অর্থাৎ বস্তুর সাথে সাদৃশ্য বা তুলনা দিয়ে আল্লাহকে বুঝতে গিয়েছে—তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে।

তাদের আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা যে বাতিল—কুরআন-সুন্নাহতে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

যে ব্যক্তি সৎ পথ পাবার আশায়, সত্যকে বক্ষে ধারণ করার অভিপ্রায়ে কুরআন নিয়ে একটু ভাববে—তাহলে অবশ্যই সত্য তার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। শরীয়তের দুর্বোধ্য বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ রাব্বে কারীমের দ্বীনের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ! অলস!

আল্লাহর ﷻ-এর ভাষায়...

> قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾
>
> "বলে দাও, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা আসমান ও যমীনে অণু পরিমাণও কোন কিছুর মালিক নয়। এ দু'য়ে তাদের এতটুকু অংশ নেই, আর তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়। তাঁর কাছে সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, তবে তাদের ব্যতীত যাদেরকে তিনি অনুমতি দেবেন। অতঃপর তাদের (অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতার কিংবা অন্যের জন্য সুপারিশ করার অনুমতিপ্রাপ্তদের) অন্তর থেকে যখন ভয় দূর হবে তখন তারা পরস্পর জিজ্ঞেস করবে- তোমাদের পালনকর্তা কী নির্দেশ দিলেন? তারা বলবে- যা সত্য ও ন্যায় তার নির্দেশই তিনি দিয়েছেন, তিনি সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরাহ সাবা ৩৪: ২২-২৩)

তিনি বলেন,

> قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾
>
> "তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে কর তাদেরকে ডাক, (ডাকলেও দেখতে পাবে) তারা তোমাদের দুঃখ-বেদনা দূর করতে বা বদলাতে সক্ষম নয়। তারা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালকের নিকট পৌঁছার পথ অনুসন্ধান করে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হতে পারবে, আর তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো ভয় করার মতই।" (সূরাহ ইসরা ১৭:৫৬-৫৭)

আরও বলেন,

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

"আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে আহবান করো না এমন কিছুকে যা না পারে তোমার কোন উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে; যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি যালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দিতে চান তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই, আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ করতে চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।" (সূরাহ ইউনুস ১০:১০৬-১০৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

"তুমি বল তাদের, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ যে, আল্লাহ আমার ক্ষতি করতে চাইলে আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা কি সে ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে, তারা কি তাঁর অনুগ্রহ ঠেকাতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, নির্ভরকারীরা তাঁর উপরই নির্ভর করে।" (সূরাহ যুমার ৩৯:৩৮)

বান্দা ও আল্লাহর মাঝে কোনো মধ্যস্থতা না বানানো, ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা যে অপরিহার্য—সে কথার প্রমাণ কুরআনে অসংখ্য বার এসেছে।

আল্লাহর বাণী,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই; সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সরলপথ প্রাপ্ত হয়।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:১৮৬)

একবার নবী করীম ﷺ-কে কেউ কথা প্রসঙ্গে বলল, 'আল্লাহ ﷻ এবং আপনি যেমনটা চান।' তখন নবীজি ﷺ বললেন, 'তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিচ্ছ? কক্ষনো নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ যা চান তা-ই হয়।' আরবি (و) 'ওয়াও' বর্ণটি 'এবং' এর অর্থে। অর্থাৎ পরের এবং পূর্বের শব্দকে মিলিয়ে দেয়। এবং সমকক্ষতা বুঝায়। আল্লাহ ﷻ ইলাহ হিসেবে যেমন একক, অনুরূপ ইবাদাতেও একমাত্র উপযোগী সত্তা। সৃষ্টি জগতের মধ্যে কেউই অনিষ্ট দমন ও উপকার আনয়নে তার সমকক্ষ নয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসে এসেছে, যা ইমাম তিরমিযি তাঁর কিতাবে উল্লেখ করে তার সনদকে হাসান পর্যায়ের বলেছেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

> "হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ তা'আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ তা'আলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ তা'আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল উম্মাত তোমার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার তাকদীরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।"

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ বলেন,

> "একজন প্রকৃত মুমিন জানে, আল্লাহ ﷻ -ই সকল জিনিসের মালিক, প্রতিপালক এবং নিয়ন্ত্রক। তথাপি সে আল্লাহর তৈরি নিযাম, উপায়-উপকরণ ও সিস্টেমকে অস্বীকার করে না। যেমন বৃষ্টিকে করা হয়েছে ফসল, শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্নের কারণ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ
وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

> "আর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:১৬৪)

অনুরূপ চন্দ্র-সূর্যকে কারণ বানানো হয়েছে সেসকল বস্তুর—যা এগুলোর প্রভাবে সৃষ্ট। সুপারিশ এবং দু'আকে কারণ বানানো হয়েছে সেসব বিষয়ের—যা এগুলো দাবি করে। যেমন—মুসলিমদের মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়া। নিশ্চয় এটা মৃত ব্যক্তির উপর আল্লাহর রহমত বর্ষণের কারণ। এবং যারা জানাযার সালাত আদায় করে—তাদের জন্য সাওয়াব হাসিলের মাধ্যম। তবে এক্ষেত্রে সকল মুমিনের উচিৎ তিনটা কারণ ভালোভাবে বুঝে নেয়া।

১) সহকারী কারণ। অর্থাৎ কোনো কাজ বাস্তবায়নে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং তা অন্য আরেকটি কারণের উপর নির্ভরশীল। এমনকি এসকল কারণের অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসকল কারণকে পরিপূর্ণতা দেননি। তার প্রতিবন্ধকতা দূর করেননি। ফলে শুধু এসব কারণ দ্বারাই বান্দার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। বরং আল্লাহ যা চান তাই হয়—যদিও বান্দা তা না চায়। এই পৃথিবীতে মানুষ যা চায়, তা হয় না। তাই হয়—যা আল্লাহ তা'আলা চান।[১৯]

২) শর'ঈ ইলম ছাড়া কোনো বস্তুকে 'কারণ' বলে বিশ্বাস করা যাবে না। যদি কেউ কোনো ধরণের দলিল প্রমাণ ছাড়া কিংবা শরীয়ত বিরোধী কোনো বস্তুকে কারণ বানায়—তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। 'কারণ' হতে হলে অবশ্যই তা দলিল এবং শরীয়ত সম্মত হতে হবে। যেমন—কোনো ব্যক্তির ধারণা হলো মান্নাত করার দ্বারা বিপদ দূর হয়। কল্যাণ অর্জিত হয়। অথচ বুখারি-মুসলিমে এসেছে—নবী কারীম ﷺ মান্নাত করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় মান্নত কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। বরং এর দ্বারা কৃপণের কিছু সম্পদ ব্যয় হয়।"

৩) দ্বীনি আমলের ক্ষেত্রে এমন কোনো জিনিসকে 'কারণ' সাভ্যস্ত করা যাবে না—যা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা ইবাদাতের ভিত্তিটা হলো অবগতির উপর। সুতরাং কোনো মানুষের জন্য আল্লাহর সাথে শরিক করা, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর কাছে প্রার্থনা করা বৈধ হবে না। যদিও তার ধারণা মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এ কারণেই শরীয়ত পরিপন্থী নব-আবিষ্কৃত পন্থায় আল্লাহর ইবাদাত গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও তা কার্যকরী মনে হয়। কেননা—মানুষ যখন শিরকে লিপ্ত হয়, শয়তান তখন তার লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে। ফলে সেই বিদ'আত, কুফর ও শিরক দ্বারা মানুষের কিছু কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, দাবি-দাওয়া পূর্ণ হয়ে থাকে। আর এতে তারা ভাবে—এটাই সৎপথ—সহিহ পদ্ধতি—আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপযুক্ত কারণ। কিন্তু এসব সঠিক নয়। কেননা এভাবে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি। অথচ রাসূল ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছে কল্যাণ অর্জন ও তাতে

---

[১৯] কেউ ইচ্ছে করল আজ সে অমুক কাজটা করবে, অমুকের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিবে, কাল সে বাড়িতে যাবে, কিংবা যে কোনো ধরণের ইচ্ছে শখ, স্বপ্ন, চাহিদা পূরণের ইচ্ছে করল। বাহ্যিক সব উপায় উপকরণ থাকতেও সেসব বাস্তবায়ন হলো না। তো এসব উপায় উপকরণ মূলত বান্দার ইচ্ছে পূরণে 'সহকারী কারণ বা উপকরণ'! মূল হলো আল্লাহর ইচ্ছা। — অনুবাদক।

পূর্ণতা দানে, এবং অকল্যাণ দমনের জন্যে। সুতরাং আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, যেভাবে করতে বলেছেন, সেটাই প্রকৃত কল্যাণ। যা তিনি নিষেধ করেছেন, সেটাই অকল্যাণ!"[২০]

পূর্ব যুগের মুশরিকরা বড় বড় শিরকে পতিত হয়েছিল শাফা'আত বা সুপারিশ নামের লেজ ধরেই। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তাদের বিশ্বাস ছিল, এসকল জিনিস কেয়ামতের দিন তাদের পক্ষে লড়বে। সুপারিশ করবে। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বারবার এসব ধ্যানধারণাকে বাতিল ও ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহর বাণী,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ কর, সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ কাজে আসবে না। বস্তুতঃ কাফিরগণই অত্যাচারী।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:২৫৪)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"তুমি কুরআন দিয়ে তাদেরকে সতর্ক কর, যারা ভয় করে যে তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দিকে একত্রিত করা হবে, যিনি ছাড়া তাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারী নেই- যাতে তারা সংযত হয়ে চলে।" (সূরাহ আন'আম ৬:৫১)

গাইরুল্লাহর কাছে যে শাফা'আত চাওয়া হয়, তা নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ ﷻ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় শাফা'আতের কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন,

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

"কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে?" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:২৫৫)

---

[২০] মাজমুউল ফাতাওয়া: ১/১৩৭-১৩৮

আল্লাহর বাণী,

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ

"তিনি যাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাদের ব্যাপারে ছাড়া তারা কোন সুপারিশ করে না।" (সূরাহ আম্বিয়া ২১:২৮)

তিনি বলেন,

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآءَ

"তারা কি আল্লাহকে ছাড়া অন্যদেরকে নিজেদের মুক্তির জন্য সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে?" (সূরাহ যুমার ৩৯: ৪৩)

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ,

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِى شَفٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

"আকাশে কতই না ফেরেশতা আছে তাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না, তবে (কাজে আসবে) যদি তিনি অনুমতি দেন যার জন্য আল্লাহ ইচ্ছে করবেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।" (সূরাহ নাজম ৫৩:২৬)

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় শাফা'আত দুই প্রকার:

১) অগ্রহণযোগ্য শাফায়াত—যেটা গাইরুল্লাহর কাছে চাওয়া হয়।

২) গ্রহণযোগ্য শাফা'আত—যেটা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়। আর এই শাফা'আতের উপযুক্ত কেবল তাওহীদে বিশ্বাসী এবং ইবাদাতে একনিষ্ঠ ব্যক্তি। এই প্রকার শাফায়াত গুরুত্বপূর্ণ দুইটি শর্ত সম্বলিত।

ক) সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহর অনুমিত লাগবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

"কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:২৫৫)

খ) সুপারিশকৃত ব্যক্তির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাগবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ

> "তিনি যাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাদের ব্যাপারে ছাড়া তারা কোন সুপারিশ করে না।" (সূরাহ আম্বিয়া ২১:২৮)

অর্থাৎ তার কথা ও কাজে।

সুতরাং যারা মুশরিক, তাদের আমলগুলো তো কেবল সামান্য কিছু ধূলিকণা! তাদের জন্যে কোনো শাফা'আত নেই। তাদের সাথে তাদের ইচ্ছার বিপরীত আচরণ করা হবে। যে সময়ের আগেই কোনো বিষয়ের তাড়াহুড়া করে—মাহরুম হওয়াই তার পরিণাম!

contents

ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ

মুশরিকদের কাফির মনে না করা, তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করা।

লেখক বলেন,

“.... যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না। অথবা তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। কিংবা তাদের ধর্মীয় মতবাদকে সঠিক বলে মনে করে, সে কাফির...”

কেননা আল্লাহ কুর'আনের অসংখ্য আয়াতে এদেরকে 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের সাথে শত্রুতা রাখার আদেশ দিয়েছেন। কারণ তারা আল্লাহ ﷻ-এর উপর মিথ্যারোপ করে। আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করে। তাদের দাবি— আল্লাহর সন্তান আছে! (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহ তাদের এই অবান্তর দাবি থেকে মুক্ত। তাদের অপবিত্র অভিযোগ থেকে পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উপর ফরয করে দিয়েছেন—যেন এদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা রাখা হয়।

একজন মানুষের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের সুযোগ-সুবিধার সিদ্ধান্ত হবে না—যতক্ষণ না সে মুশরিকদের কাফির বলে। সুতরাং যদি কেউ কুফরি প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যাপারে ইতস্তত করে, কিংবা তা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও তাদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ করে—তাহলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত!

যে বক্তি তাদের ধর্মকর্মকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করে, তাদের তাগুত ও কুফরিকে উত্তম মনে করে—তাহলে এমন ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। কেননা সে ইসলামের হাকিকত তথা বাস্তবতাটাই বোঝেনি। আর ইসলামের হাকিকত হলো— তাওহীদি বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। একনিষ্ঠভাবে তার হুকুম মানা। এবং শিরক ও শিরককারীদের থেকে নিজের বারা'আতের ঘোষণা দেয়া।

তাই যারা তাদের ধর্মকে সহিহ বলে, তাদের ধর্মকে উত্তম মনে করে, তারা তো শুধু কাফিরই নয় বরং কাফিরদের অভিভাবক!

সহিহ মুসলিমে এসেছে, সা'দ ইবনু ত্বরিক তাঁর পিতা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি

> “যে ব্যক্ত বলে لا إله إلا الله (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ), অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর উপাসনা করা হয় তা অস্বীকার করে, তাহলে তার রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ। এবং তার হিসেব আল্লাহর সাথে।”[২১]

কোনো মুসলিমের রক্ত-সম্পদ এতটুকুতেই নিরাপদ নয় যে, সে বলবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"! বরং তার জন্য আবশ্যক হলো সাথে সাথে এটাও যুক্ত করা যে—

[২১] সহিহ মুসলিম-৩৩

আল্লাহ্ ছাড়া আর যা কিছুর ইবাদাত করা হয়, সেসব কুফরি। আমি সেসব ইবাদাত অস্বীকার করছি। যদি সে তা না করে—তাহলে তার রক্ত-সম্পদ মুসলিমদের জন্য হারাম নয়। রক্ষিত নয়। তার উপর তরবারির প্রয়োগ হবে।[২২] কেননা সে মিল্লাতে ইবরাহীম তথা ইবরাহীম ﷺ এর মূলনীতিকে অগ্রাহ্য করেছে। অথচ আল্লাহ ﷻ আদেশ করেছেন সেই মূলনীতি অনুসরণের। তন্মধ্যে একটি হলো—নমনীয়তা হবে ইবরাহীমের মানহাজে যারা আছে—তাদের সাথে। আল্লাহর দুশমনদের চাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলার কোনো অবকাশ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَٰهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَٰوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُۥٓ
>
> "ইবরাহীম ও তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য আছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল- 'তোমাদের সঙ্গে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে।" (সূরাহ মুমতাহিনা ৬০:৪)

এই হলো ইবরাহীম ﷺ এর মানহাজ। যে এ মানহাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল—সে নিজেকে নির্বোধ প্রমাণ করল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> لَقَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا

---

[২২] একজন মুসলিম যদি ঈমান আনার পর ইসলামের কোন মূলনীতিকে অস্বীকার করে, কথার মাধ্যমে কিংবা কর্মের মাধ্যমে—তাহলে সে মুরতাদ বলে গণ্য হবে। আর ইসলামি রাষ্ট্রে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে তা বাস্তবায়নে অজ্ঞত কোনো ওযর কিনা সেটা যাচাই করতে হবে এবং তাওবার সুযোগ দিতে হবে। ইবনু কুদামাহ "আল-মুগনি"-তে (৯/১৮) বলেছেন, অধিকাংশ আলিমের মতে এক্ষেত্রে তাকে তাওবা করার জন্য তিনদিন সুযোগ দেওয়া হবে।
(যেসব ক্ষেত্রে তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়, সেক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না)
বিস্তারিত দেখুন: islamqa.info ফাতওয়া নং- ১৪২৩১, ইবনু তাইমিয়্যাহ লিখিত 'আস সারিম আল-মাসলূল'- ৩/৬৯৬, শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবির উক্তি, মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ তাওযীহাত: ৪৬২—অনুবাদক

"নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যে মা'বুদদেরকে (তাগুতকে) অমান্য করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:২৫৬)

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ বলেন, "তাগুতকে অস্বীকারের একটি পদ্ধতি হলো গাইরুল্লাহর ইবাদাতকে বাতিল বলে বিশ্বাস করা। তা বর্জন করা। ঘৃণা করা। এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলা। তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।"

এই বর্ণনার পর আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে ঐ সকল শাসকদের অবস্থা, যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে। অথচ তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। তাদেরকে কাছে টানে। সম্মাননা দেয়। পরস্পর এমন সম্পর্ক গড়ে তুলে, যেন তারা সহোদর! শুধু তাই নয়—তারা ধর্মপ্রাণ মুসলিম ও আলিমগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তাদের কষ্ট দেয়। কারাগারের প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখে। এর পরেও কি তাদের মাঝে ইসলামের ছিটেফোঁটা থাকতে পারে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরাহ মাইদা ৫:৫১)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ

"মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ছাড়া কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে, মূলতঃ যে এমন করবে আল্লাহর সাথে তার কোন কিছুরই সম্পর্ক নেই।" (সূরা আলে ইমরান ৩: ২৮)

অতএব প্রতিটা মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো—দ্বীনকে পরিপূর্ণ রূপে মানা। মুশরিকদের কাফির বলা। তাদের সাথে শত্রুতা রাখা। ঘৃণা করা। এমনি তাদেরকেও ঘৃণা করা—যারা তাদের ভালোবাসে, তাদের সাথে সখ্যতা রাখে, কিংবা আল্লাহ ও

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে শরীয়ত সম্মত কোনো কারণ ছাড়াই মুশরিকদের দেশ-দুয়ারে ধর্ণা দেয়।

সকল মুসলিমের উচিৎ ইবরাহীম ﷺ এর আদর্শকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। তাঁকে আদর্শ মানা। কুরআনে এসেছে,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾

"স্মরণ কর, ইবরাহীম ﷺ যখন তার পিতাকে ও তার জাতিকে বলেছিল- তোমরা যেগুলোর পূজা কর, সেগুলো থেকে আমি সম্পর্কহীন। আমার সম্পর্ক আছে শুধু তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।" (সূরাহ যুখরুফ ৪৩:২৬,২৭)

আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো আমরা আমাদের সহিহ আকিদা ও মূল দ্বীনে ফিরে আসবো। কাফিরদের ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের যে আদেশ করেছেন— পরিপূর্ণ রূপে তা বাস্তবায়ন করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَٰتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"হে মু'মিনগণ! যে সব কাফির তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাতে তারা তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা দেখতে পায়, আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।" (সূরাহ তাওবা ৯:১২৩)

আল্লাহর ইরশাদ,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

"মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে ঘেরাও কর, তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু তারা যদি তাওবাহ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও..." (সূরাহ তাওবা ৯:৫)

যখনি মানুষ কুরআন-সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—আল্লাহ তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেন। তাদের উপর শত্রুদের প্রবল করে দেন। যখনি অধিকাংশ রাষ্ট্রের শাসকগণ আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অভিশপ্তদের অভিশপ্ত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আত্মতৃপ্তি লাভ করে—তখন সে জাতির

অধঃপতন শুরু হয়ে যায়। দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর শত্রুরা তাদের উপর একের পর এক এমন আযাব চাপিয়ে দেয়, তারা সেটা বুঝেও না। বুঝবে কি করে? তাদের শাসক তো গুরুত্ব দিচ্ছে শত্রুর সাথে সৌহার্দ্য রক্ষার ব্যাপারটা। কথিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনটা! এতে দীনের মান এলো কি গেল, সে নিয়ে তো কোনো পরোয়া নেই। অথচ ইজ্জত ও সম্মান হলো দ্বীনকে সাহায্য করা এবং আল্লাহর জমিনে এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে। কেননা যার শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, তার জন্য অপরিহার্য হলো যথাসাধ্য এ পথে মেহনত করা। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ ব্যাপারে বেখবর! এই সমস্যার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই দিকটার উপর মারকায কায়েমে আল্লাহকে যতটা বেশি স্মরণ ও গ্রহণ করা দরকার ছিল, তাতে কমি করা। যাই হোক, আল্লাহ-ই একমাত্র সাহায্যকারী।

প্রতিটা মুসলিমের জানা উচিৎ—কাফিররা ইসলাম ও মুসলিমের সবধরণের ক্ষতিসাধনে সদা তৎপর। তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। জিঘাংসাবৃত্তির কারণে তারা চায় মুসলিমরা তাদের স্বীয় দ্বীন থেকে সরে আসুক। সুতরাং মুসলিমরা যদি তাদের দ্বীন ধ্বংসের এ পরিকল্পনার ব্যাপারে সতর্ক না হয়, গাফলতের এই ঘুম থেকে জাগ্রত না হয়—তাহলে অতি শীঘ্র তারা আফসোসে আঙ্গুল কামড়াবে, আর তখন এই আফসোস কোনো কাজে আসবে না। দ্রুতই তারা তাদের কর্মের ফল দেখতে পাবে! যে যুদ্ধ করে না, সে তো মরবেই।

পৃথিবীর প্রত্যেকটা আলিম, বক্তা, ইমাম, খতিবের দায়িত্ব হলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে, শর'ঈ প্রমাণের ভিত্তিতে কাফিরদের সাথে সম্পর্কের ভয়াবহতা ও ক্ষতির বিষয়টা মানুষের সামনে তুলে ধরা। তাদের দেশে গমনাগমন, তাদেরকে স্বদেশে আহবান ও আপ্যায়নের ঝুঁকি এবং শরীয়তের আদেশ-নিষেধগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপন করা। কেননা আল্লাহ ﷻ মুসলিম ও কাফিরের মাঝে সকল প্রকার বন্ধন ও দহরম মহরম ছিন্ন করেছেন। যদিও সে নিকটাত্মীয় হয়! যেমন আল্লাহর আদেশ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের পিতা আর ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীকেই বেশি ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম।" (সূরাহ তাওবা ৯:২৩)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ الْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ

"আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালবাসে- হোক না এই বিরোধীরা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন, আর নিজের পক্ষ থেকে রূহ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদেরকে তিনি দাখিল করবেন জান্নাতে..." (সূরাহ মুজাদিলা ৫৮:২২)

আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন ঘোষণা,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের খবর পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা রসূলকে আর তোমাদেরকে শুধু এ কারণে বের করে দিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্য় বিশ্বাস কর। তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি কামনায় আমার পথে জিহাদে বের হয়ে থাক, তাহলে তোমরা কেন গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর আর তোমরা যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব ভাল করেই জানি। তোমাদের মধ্যে যে তা করে সে সরল পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।" (সূরাহ মুমতাহিনা ৬০:১)

একারণেই রাসূল ﷺ বলেছেন, "কোনো কাফির কোনো মুসলিমের মিরাস (উত্তরাধিকারী সম্পদ) পাবে না। কোনো মুসলিমও কোনো কাফিরের মিরাস পাবে না।"

যাতে করে কাফির ও মুসলিমের মাঝে কোনো প্রকার সম্পর্ক বাকি না থাকে। প্রিয়নবী তাদের প্রতি ভালোবাসা রাখতে বারণ করেছেন। তাদের মাঝে

উত্তরাধিকারী বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম উসামা বিন যায়েদ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।[২৩]

বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, "কোনো কাফির হত্যায় মুসলিমের প্রাণ নেয়া যাবে না।"[২৪]

কেনই বা এমনটা হবে না, স্বয়ং আল্লাহ যেখানে ঘোষণা করছেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"ওহে বিশ্বাসীগণ! মুশরিকরা হল নাপাক।" (সূরাহ তাওবা ৯:২৮)

সুতরাং প্রতিটা মুসলিমের মনে রাখা প্রয়োজন—ইহুদি, নাসারা, মুশরিক এবং অন্যান্য কাফিরদের সাথে মুসলিমদের কোনো শান্তিচুক্তি হতে পারে না। কেননা তারা মুসলিমের শান্তি চায় না। তাদের উপর কোনোক্রমেই সন্তুষ্ট হবে না। যতক্ষণ না মুসলিমরা তাদের ধর্ম গ্রহণ করে। পায়ে পায়ে তাদের অনুসরণ করে।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"ইয়াহূদী ও নাসারারা তোমার প্রতি রাজী হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের আদর্শ গ্রহণ কর। বল, 'আল্লাহর দেখানো পথই প্রকৃত সুপথ এবং তুমি যদি জ্ঞান আসার পরেও এদের ইচ্ছে অনুযায়ী চল, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর ক্রোধ হতে রক্ষা করার মত কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না'।" (সূরাহ বাক্বারাহ-২:১২০)

এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হুশিয়ারি। হুশিয়ারি তাদের প্রতি—যারা কাফিরদের অনুসরণ করে। যারা এমনটা করে—তাদেরকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা করার মতো কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না!

রাসূল ﷺ মুসলিমদের আদেশ করেছেন মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে। তাদের থেকে দূরে থাকতে। যাতে সে তাদের মত না হয়ে যায়। বরং তিনি তো বিষয়টিতে আরও গুরুত্ব দিয়েছেন! বলেছেন, "আমি সে সকল মুসলিমের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত—যারা মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করছে।" সাহাবাগণ আরজ করলেন,

---

[২৩] বুখারি- ১৫৮৮, মুসলিম- ১৩৫১, আবু দাউদ- ২২০৯, তিরমিযি- ২১০৭
[২৪] বুখারি- ৬৯১৫, মুসলিম- ১৩৭০, নাসাঈ- ৪৭৪৪

ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন? তিনি বললেন, "দুই অঞ্চলের আগুনকে এক দৃষ্টিতে দেখা যাবে না?"[২৫]

বাহয ইবনু হাকিম তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সনদেই হাদীসটি ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا، أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ

"আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণেরর পরও তাদের কোন আমল কবুল করবেন না, যতক্ষন না তারা মুশরিকদের পরিত্যাগ করে মুসলিমদের কাছে এসে যায়।"[২৬]

দ্বীনের এই দুরাবস্থা, এবং মুসলিমদের অবস্থা ও অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ও অধঃপতনের অভিযোগ আমরা আল্লাহর কাছেই করছি। মুসলিমরা এসব সূক্ষ্ম, সুস্পষ্ট বিধান, দলিল-প্রমাণ শুনবে, বুঝবে। এরপরেও তারা কাফিরদের কাছে যাবে। তাদের সাথে বসবে। মেহমানদারি করবে। খোশগল্পে মজে যাবে!

অথচ আল্লাহর নবী বলেছেন,

"যে কাফিরদের সাথে মিলিত হবে। তাদের সাথে উঠাবসা করবে। সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ সামুরাহ ইবনু জুন্দুব থেকে বর্ণনা করেছেন। সনদে কিছুটা দুর্বলতা আছে। তবে এর সমর্থনে আরও হাদীস (শাওয়াহেদ) রয়েছে। পূর্বেই আমরা তা উল্লেখ করেছি।

হায়!
কোথায় আজ মিল্লাতে ইবরাহীম?
কোথায় আজ ইবরাহীমের আদর্শ?
কোথায় আজ হুব্বু ফিল্লাহ? (আল্লাহ জন্য কাউকে ভালোবাসা)
কোথায় আজ বুগযু ফিল্লাহ? (আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করা)
অধিকাংশ মানুষ তো এদিকে মাথা তুলেও থাকায় না।

---

[২৫] হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু দাউদ (২৬৪৫) ও তিরমিযি (১৬০৪) রহিমাহুমাল্লাহ। সনদটি হলো—ইসমাঈল বিন আবি খালিদ বর্ণনা করেছেন কায়েস বিন আবি হাযিম থেকে, তিনি জারির থেকে। ইনারা সবাই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ইমাম তিরমিযি সহ আরও অনেকে তা'লীল করেছেন, ইরসালের কারণে। এটাই সত্য। তবে এই হাদীসটির সমর্থনে আরও কিছু 'শাহিদ' হাদীস রয়েছে'
[২৬] নাসাঈ- ২৫৬৮

মন থেকে একটু ভাবেও না। তারা আজ বেখবর! গাফিলতির ঘুমে আচ্ছন্ন!

আল্লামা সুলায়মান ইবনু সাহমান কি মুক্তাতুল্য কথাই না বলেছেন,

তিনি বলেন, (কবিতা)

"মিল্লাতে ইবরাহীম, যে মানহাজটি ধ্বংসের লক্ষ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আজ তার চিহ্ন ও নিদর্শন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
সেই মানহাজ আমাদের মধ্য থেকেও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে,
আর কেনই বা হবে না!
গোটা দুনিয়া জুড়ে এই মানহাজের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাবায়ু!
আর ইবরাহীমের সেই মানহাজ তো হলো কেবল আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহর জন্যই কারো উপর ক্রোধান্বিত হওয়া! বন্ধুত্ব করা!
তেমনি ভাবে সকল পথভ্রষ্ট ও পাপিষ্ঠ থেকে বারাআত ঘোষণা দেয়া!
এই মানহাজের এমন কোন পথিক নেই—যে বনী হাশেমের মরুচারী নবীর দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে!
তাইতো দ্বীনের উপর আপতিত হওয়া দূর্যোগ,
যার কারণে সহজ সরল মিল্লাত (দ্বীন) আজ নিঃশেষ প্রায়,
সেটাকে আমরা কোন দূর্যোগই মনে করছি না!
আক্ষেপ করছি নিজেদের ত্রুটি ও দায়িত্বহিনতার জন্যে
এবং আশ্রয় চাইছি আল্লাহর নিকট গুনাহ ও কবীরাহ গুনাহ থেকে!
আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অভিযোগ করছি ঐ হৃদয়ের
যা কঠিন নিঃস্প্রাণ হয়ে গিয়েছে
এবং পাপ-পঙ্কিলতার অপচ্ছায়া যার উপর ঝং ফেলেছে!
আমরা কি এমন নই, যখন জালিমদের পক্ষ থেকে মুশরিকদের ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী কলঙ্ক ও কদর্যতায় ব্যাক্তি আমাদের নিকট আগমন করে,
তখন আমরা তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা, বিনম্র অভিবাদন, প্রশংসা ও গুণকীর্তনের জন্য যেন আত্মহারা?
তাদের সম্মানে ভোজের আয়োজন করতে আমরা প্রায় পাগলপারা?
প্রকৃত মুমিনগণ ঐ সকল মুসলিমদের থেকে বারাআত ঘোষণা করে,
যারা দারুল হারবে বসবাস করে কোন বারাআত ঘোষণা ছাড়াই!
কিন্তু আমাদের মতে জৈবিক ও অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের চিন্তার অর্থ হলো,
সকল আল্লাহ-দ্রোহীদের সাথে গুনাহগার বান্দাদের সন্ধিচুক্তি স্থাপন!"

আবার মূল বক্তব্যে ফিরে যাই। লেখক বাক্যের শেষাংশে বলেছেন,

..."অথবা তাদের মাযহাব/ধর্মকে সঠিক বলে"....

ঐ সকল তন্ত্র-মন্ত্র এই কথার অন্তর্ভুক্ত—যেদিকে আজকাল অধিকাংশ মানুষ ধাবিত। এবং একে অন্যকে আহবান করছে। যেমন এদের অনেকে আছে মানুষকে গণতন্ত্রের দিকে ডাকে[২৭]; সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দিকে ডাকে[২৮];

---

[২৭] গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের বেশ কিছু সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে। নীচে সামান্য কিছু তুলে ধরা হলো।

১) গণতন্ত্র বলে, 'জনগণই সকল ক্ষমতার মূল উৎস' অর্থাৎ জনগণ যা চাইবে তাই হবে। সেটা শরীয়ত বিরোধী হলেও। যেমন তারা চাইলে সমকামিতা, মদের বৈধতা দিবে। অথচ ইসলাম বলে সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। "বলঃ সব কিছুর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার হাতে? তিনি সকলকে আশ্রয় দেন, তাঁর উপর কোন আশ্রয় দাতা নেই।" (সূরা মুমিন ২৩:৮৮)

"হে আল্লাহ! তুমি সমুদয় রাজ্যের মালিক, যাকে ইচ্ছে রাজ্য দান কর আর যার থেকে ইচ্ছে রাজ্য কেড়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছে সম্মানিত কর আর যাকে ইচ্ছে অপদস্থ কর, তোমারই হাতে সব রকম কল্যাণ, নিশ্চয়ই তুমি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান'। (সূরাহ আল ইমরান ৩:২৬)

২) গণতন্ত্র বলে 'অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে'— যদিও সমাজের অধিকাংশ লোক মূর্খ, অজ্ঞ, কিংবা ইসলাম বিদ্বেষী হয়, তবুও! অথচ ইসলাম বলছে ভিন্ন কথা। অধিকাংশের মতামত সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি সূত্র মাত্র। একমাত্র সূত্র নয়। কুরআন এসেছে, "যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মত চলো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। (সূরাহ আন'আম ৬:১১৬)

"অধিকাংশ মানুষই সঠিক জ্ঞান রাখে না।" (সূরাহ ইউসুফ ১২:৬৮)

"তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান।" (সূরাহ মায়িদা ৫:৫৯)

"তাদের অধিকাংশই কেবল অনুমান ও আন্দাজের ওপর চলে। কিন্তু সত্য ও বাস্তবতার সময় অনুমান ও আন্দাজ কোন কাজেই আসে না।" (সূরাহ ইউনুস ১০: ৩৬)

"আপনি বলে দিনঃ পবিত্রতা (হক) ও অপবিত্রতা (বাতিল) কখনই এক সমান নয় অপবিত্রতার আধিক্য যদিও তোমাকে আশ্চর্য করে।" (সূরাহ মায়িদা ৫:১০০)

৩) গণতন্ত্র বলে "দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক parliament" কিন্তু ইসলাম বলে, "আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সব কিছুর একক আধিপত্য ও মালিক একমাত্র আল্লাহ। (সূরা মায়িদা ৫:১২০)

৪) গণতন্ত্র বলে, 'পার্লামেন্ট যে কোন সময় যে কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে! যদিও সে আইন কুরআন বিরোধী হয়। এক্ষেত্রে সে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে!' অর্থাৎ পার্লামেন্ট চাইলে মদ, জুয়া, ব্যভিচার, পতিতা, সমকামিতা ও সুদকে বৈধতা দিতে পারবে। হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার অধিকার রাখে। অথচ ইসলাম বলে "বিধান প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।" (সূরা আন'আম ৬:৫৭)

মানুষ যা করবে তা কুপ্রবৃত্তি ও স্বার্থ চরিতার্থতা থেকে মুক্ত নয়। তাই সে অবশ্যই জবাবদিহিতার মুখাপেক্ষী। একমাত্র আল্লাহই তা থেকে ঊর্ধ্বে। "তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, বরং তারা জিজ্ঞাসিত হবে তাদের কর্মের ব্যাপারে।" (সূরা আম্বিয়া ২১:২৩)

৫) গণতন্ত্র বলে, 'ভোটার অধিকারে সবাই সমান' অর্থাৎ একজন অশিক্ষিত, অজ্ঞ, ভিক্ষুক, রিক্সাওয়ালার ভোটের যেই মান, একজন আলিম কিংবা পেইচডিধারি ব্যক্তির ভোটের মান একই। সমাজে যদি ৫৫% ও মূর্খ ও দুশ্চরিত্র লোক থাকে, তাহলে তাদের মনমতই সরকার হবে! দেশ চলবে! অথচ ইসলাম বলছে,

"যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কখনোই এক সমান নয়।" (সূরা যুমার ৩৯:৯)

"অন্ধ (মূর্খ) আর চোখওয়ালা (জ্ঞানী) সমান নয়। এবং অন্ধকার (অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা) আর আলোও (জ্ঞান, হেদায়াত) সমান নয়।" (সূরা ফাতির ৩৫:১৯-২০)

৬) গণতন্ত্র বলে, 'জনগণের মাঝে নতুন কোন সমস্যা দেখা দিলে তা পার্লামেন্টে উত্থাপন করতে হবে। কিংবা গণভোটে তার সমাধান দেয়া হবে', অথচ ইসলাম বলে, "যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে তোমরা সেই বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও" (সূরাহ নিসা ৪:৮৩)

৭) গণতন্ত্র বলে, 'জনগণকে সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা বজায় রাখতে হবে', কোনো ধর্মকেই ভ্রান্ত বলা যাবে না। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা। বর্তমানে এর মুখরোচক স্লোগান— 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। অথচ ইসলাম বলে, "আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম।" (সূরা আলে ইমরান ৩:১৯)

ইবরাহীমের মানহায ও তাওহীদ হলো,

"তোমাদের সঙ্গে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে।" (সূরাহ মুমতাহিনাহ ৬০:৪)

এই হলো গণতন্ত্র ও ইসলাম! একারণেই সকল আলিমের মতেই মানবরচিত এই গণতন্ত্র সুস্পষ্ট কুফরি। সুতরাং যে এটাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে, তার প্রতি বিশ্বাসী হবে, এবং এর বিপরীতে ইসলামকে সেকেলে, বর্বর মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা বলে মনে করবে, সে কাফির।

বিস্তারিত দেখুন: মুফতি মনসুরুল হকের 'কিতাবুল ঈমান'। এবং তার রচিত 'গণতন্ত্র ও ইসলাম' নামক আলোচিত প্রবন্ধ। ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ: ৬২৪, আল্লামা তকী উসমানীর 'ইসলাম ও রাষ্ট্রচিন্তা'।—অনুবাদক

[২৮] ধর্মনিরপেক্ষতা। ইংরেজিতে Secularism "সেকিউলারিজম"। এটি ল্যাটিন শব্দ। অর্থ অস্থায়ী এবং প্রাচীন। কোন পাদ্রী যদি বৈরাগ্যবাদী জীবন পরিহার করে বৈষয়িক জীবন যাপনের অনুমতি লাভ করে, তাহলে তাকে 'সেকিউলার' বলা হয়। পরিভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularism এরঅর্থ হল ধর্মের প্রভাব থেকে রাজ্য, নীতি ও শিক্ষা ইত্যাদিকে মুক্ত রাখা।'

ইউরোপে পাদ্রীদের মনগড়া মতামতের সাথে যখন বৈজ্ঞানিকদের গবেষণালব্ধ মতামতের দ্বন্দ্ব দেখা দিল এবং তার ভিত্তিতে তাদের উৎখাত করার জন্য 'গীর্জা বনাম রাষ্ট্রের লড়াই' নামক ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালিত হল, তখন সংস্কারবাদীরা একটা আপস রক্ষার জন্য মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে প্রস্তাব দিল যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকুক। আর সমাজের ও পার্থিব জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা হোক। এখান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের যাত্রা শুরু। ফলে পরবর্তীতে সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নীতি নির্ধারণে ধর্ম অকার্যকর হয়ে পড়ে।

এটা একটা কুফরি মতবাদ। ইহুদি, খৃষ্টান হলো মেয়াদউত্তীর্ণ ও বিকৃত ও বিবর্জিত ধর্ম। তাই তারা যুগ ও বাস্তবতার সাথে সমান গতিতে এগিয়ে যেতে পারেনি। বরং প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার সাথে সর্বকালে পালনযোগ্য, শান্তি ও উন্নতির ধর্ম ইসলামকে তুলনা করা মারাত্মক অপরাধ। কারণ ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটা মানুষের চলাফেরা, লেনদেন, আকিদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক, রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, যুদ্ধ-সন্ধি, আইন-বিচারসহ সকল বিষয়ের পূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়া আছে। কুরআন ও সুন্নাহ হলো একটি

অনেকে ডাকে বাথপার্টি তথা জাতীয়তাবাদের দিকে[২৯] এসব পথ ও পন্থা কাফিরদের বানানো ভ্রান্ত মতবাদ! যদিও এসবের অনুসারী ও পুরোধাদের আজ নামে মুসলিম বলা হয়, কিন্তু বাস্তব্যতা কি আর নাম রাখলেই বদলে যায়!

আদর্শ গাইডলাইন। সর্বযুগে, সকল মানুষের জন্যই তা উপযোগী। সূরা মায়িদার তিন নং আয়াত এবং বিদায় হজ্বের ভাষণ তার প্রমাণ।
আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, সত্য পথের নির্দেশ, রহমাত আর আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।" (সূরাহ নাহল ১৬:৮৯)

অন্যত্র এসেছে, "আল কুরআন আমি কোন কিছুই বাদ দেইনি।" (সূরাহ আন'আম ৬:৩৮)

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামের এই ব্যাপকতাকে অস্বীকার ও অপছন্দ করে। তাদের নেতা ব্রেডলফ এর মত ছিল, ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস প্রতিহত করাই সেকিউলারিজম এর কর্তব্য। তিনি মনে করতেন, ধর্মের এই সব বিধান কুসংস্কারমূলক। এ ধারণা, এ বিশ্বাস বস্তুগত উন্নতির সবচেয়ে বড় বাধা। আর ইসলামের কোন অংশকে অস্বীকার বা অপছন্দ করা কুফুরী। যে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসকে কুসংস্কারমূলক ধারণা-বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করে, সে কাফির।
বিস্তারিত দেখুন: ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ: ৬২৬, কিতাবুল ঈমান, তাফসীরে সূরাহ তাওবাহ: ১৯১-১৯২ — অনুবাদক।

[২৯] nationalism অথা জাতীয়তাবাদের মূলনীতি বা চেতনা হলো, জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি হওয়া চাই গোত্র, দেশ ও ভাষা। যদি তা ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয় তাহলে তাকে বলা হবে পশ্চাৎপদতা ও মধ্যযুগীয় চেতনা।
একটা দেশ একটা জাতি। একই ভাষাভাষী সবাই একটা জাতি। চাই সে দেশ মুশরিক প্রধান হোক কিংবা মুসলিম। চাই সে ভাষাভাষীরা বিধর্মী প্রধান হোক কিংবা ইসলাম প্রধান। যে মুসলিম আমেরিকায় সে আমরিকান জাতীয়তাবাদ। যে হিন্দুস্তানে, সে হিন্দুস্তানী জাতীয়তাবাদ। এভাবে প্রত্যেক দেশ পৃথক পৃথক একটি জাতি। এই জাতীয়তা রক্ষায় নিজের অস্ত্র ধরা এবং সর্বোচ্চটা বিলিয়ে দেয়াই হলো জাতীয়তাবাদের মূল আদর্শ। প্রতিপক্ষ মুসলিম না অমুসলিম তা বিবেচ্য নয়।
এটা এমন এক থিউরি, যা মানব জাতিকে ছিন্নভিন্ন করার অনেক বড় উপাদান।
নিকট অতীতে মুসলিমদের জাতীয় বিপর্যয়ের সূচনা ছিল খেলাফতে উসমানীর পতন। খেলাফতে উসমানী তার শত দুর্বলতা সত্ত্বেও মুসলিমদের কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা আরবদেরকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে 'আরব লীগ' প্রতিষ্ঠা করল এই জাতীয়তাবাদের 'পানিপড়া' দিয়ে। অপরদিকে মোস্তফা কামাল পাশার সমর্থকদের তুর্কি জাতীয়তাবোধে উসকে দিল। যার ফলে মুসলিমদের ঐক্য টুকরা টুকরা হয়ে গেল।
বাথ পার্টি হল আরব জাতীয়তাবাদ। এই বাথ পার্টির একটি স্লোগান ছিল,
آمنت بالبعث ربا لا شريك له +وبالعروبة دينا ما له ثاني
"আমি বাথ পার্টিকে রব হিসেবে বিশ্বাস করি, তার কোন অংশীদার নেই। আমি আরব জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসেবে বিশ্বাস করি, তার কোনো বিকল্প নেই।"
অনৈতিকভাবে জাতীয়তাবোধ তৈরি করে ঐক্যে ফাটল ধরানো কিংবা ভিন্ন জাতির সাথে বৈরিতা ও বিদ্বেষ পোষণ করার কোনো শিক্ষা ইসলামে নেই। এবং ইসলাম তা সমর্থন করে না। একবার

এই দুর্দিনে আমাদের উপর যে আপদ নেমে এসেছে—সে অনুযোগ ও মুক্তির আকুতি একমাত্র আল্লাহর কাছে। এখন তো মানদণ্ড পরিবর্তন হয়ে গেছে। অধিকাংশ মানুষ আজ কাজ ছেড়ে নামের উপর চলছে। নামের অপব্যবহার করছে। দলিল-প্রমাণ ছাড়া কেবল ফাঁকা বুলি ছুড়ছে! আল্লাহর যে দুশমন রাতদিন, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশে দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়ছে, যুদ্ধ করছে—দিন শেষে মূর্খ, অজ্ঞ, অসতর্ক খাহেসাত পূজারীদের কাছে সে-ই কিনা পাক্কা মুমিন ও তাওহীদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসী! কারণ—এরা শাহাদাত উচ্চারণকারী! কালিমা পাঠকারী! কিন্তু তার এই কালিমা পাঠ এবং উচ্চারণ কোনো কাজেই আসবে না, কেননা সে ইবলিশের

এক মুহাজির ও এক আনসারের মাঝে ঝগড়া হলো। তখন মুহাজির সাহাবি তাঁর মুহাজির সম্প্রদায়ের কাছে 'বাচাও হে মুহাজির!' বলে সাহায্যের আবেদন করল। এবং আনসার সাহাবি তাঁর আনসার সম্প্রদায়ের কাছে 'বাচাও হে আনসার!' বলে সাহায্যের আবেদন করল। তখন রাসূল ﷺ কঠোর প্রতিবাদ করলেন। বললেন, এটা খুবই নিকৃষ্ট কথা যে মুহাজিররা মুহাজিরকে সাহায্য করবে, আনসাররা আনসারকে সাহায্য করবে; সাহায্য তো করতে হবে সব সময় ন্যায় ও হকের পক্ষকে। সেটা যদি নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও হয়।

মুসলিমদের ঐক্যের ভিত্তি হবে দীন ও ধর্মের ভিত্তি। কোনো ভাষা, বর্ণ কিংবা অঞ্চলের ভিত্তিতে নয়। আল্লাহ্ বলেন,

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির, কেউ মু'মিন।" (সূরাহ তাগাবুন-২)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, "তোমাদের সঙ্গে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে।" (সূরা মুমতাহিনাহ ৬০:৪)

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরাহ আলে ইমরান ৩:১০৩)

জাতীয়তাবাদ মূলত দলপ্রীতি ও দলান্ধতা। চরম পর্যায়ের আসাবিয়্যাত সৃষ্টির বিষাক্ত বীজ। যা সম্পূর্ণ হারাম। হাদীসে এসেছে,

"যে ব্যক্তি আসাবিয়্যাতের দিকে ডাকে বা গোত্রের দোহাই দিয়ে আহবান করে লোকদেরকে সমবেত করে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর ঐ ব্যক্তিও আমার দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাতের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে এবং সেও নয় যে আসাবিয়্যাতের উপর মারা যায়।" (আবু দাউদ- ৫১২১)

"যাকে গোত্রীয়তার পতাকাতলে হত্যা করা হয়েছে, এমতাবস্থায় যে সে আসাবিয়্যাতের আহবান কিংবা সাহায্যকারী। তাহলে সে জাহেলীয়্যাতের সাথে মারা গেল।" (সহিহ মুসলিম- ১৮৫০)

সুতরাং জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করা, তা প্রতিষ্ঠায় লড়াই করা এবং ধর্মীয় ঐক্যকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দেয়া সুস্পষ্ট কুফরি।

বিস্তারিত দেখুন: তাফসীরে সূরা তাওবা- ১৭৯, কিতাবুল ঈমান, ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ: ৬২৮-৬৩১। — অনুবাদক।

সৈন্যদলের সদস্য। নিজের জান-মাল দিয়ে দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত! আল্লাহ্ আমাদের হেফাযত করুন।

ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ

রাসূল ﷺ-এর আনীত দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা কিংবা আইনকে উত্তম মনে করা।

লেখক বলেন,

... "যে বিশ্বাস করে নবী ﷺ-এর পদর্শিত পথ (সুন্নাহ) ব্যতীত অন্য পথ ও মত অধিক পরিপূর্ণ; অথবা তাঁর আনীত আইনের চেয়ে অন্যের বানানো আইন অধিক উত্তম, যেমন তাগুতের আইনকে ইসলামি আইনের উপর প্রাধান্য দেয়া, তাহলে সে কাফির।"....

প্রথম মাস'আলা: প্রথম মাস'আলা হলো, "যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে নবী ﷺ-এর পদর্শিত পথ ব্যতীত অন্য পথ ও মত অধিক পরিপূর্ণ।"

এটা একটা খতরনাক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমন বিশ্বাস সোজা জাহান্নামে নিয়ে ফেলবে। কেননা—তা সুস্পষ্ট বিবেক ও বর্ণনার (কুরআন-হাদীস) পরিপন্থী!

রাসূলে আকরাম জুমু'আর খুতবায় বলতেন, "হামদ-সলাতের পর; সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী। সর্বোত্তম পথ ও মত হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথ ও মত।"

ইমাম মুসলিমসহ অনেক মুহাদ্দিস জাবির رضي الله عنه থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর পথ ও মতই যে পরিপূর্ণ—এব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। কেননা এটা ওহী নির্দেশিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

> "আর সে মনগড়া কথাও বলে না। তাতো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" (সূরাহ নাজাম ৫৩:৩-৪)

এ কারণেই সকল ইমাম, ফকিহ, মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত যে—রাসূলের পথ, মত তথা সুন্নাহ—ইসলামি শরীয়তের দ্বিতীয় মূল ভিত্তি। এবং তা বিধিবিধান প্রণয়নে স্বয়ং সম্পূর্ণ। এটা কুরআনের মতই হালাল-হারামের বিধান দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

একবার রাসূল ﷺ দেখলেন উমার رضي الله عنه এর হাতে তাওরাত কিতাবের কিছু পাতা। তিনি বললেন,

> "ওহে খাত্তাব পুত্র! তোমরা কি শরীয়তে মুহাম্মাদীর ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত? আরে আমি তো তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দ্বীন নিয়ে এসেছি! শপথ সেই সত্তার, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মূসা عليه السلام আজ জীবিত থাকতেন। আর তোমরা তাকে

অনুসরণ করতে। আমাকে ছেড়ে দিতে। তাহলে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হতে!”[৩০]

সুতরাং শরীয়তে মুহাম্মাদ ﷺ সকল শরীয়তের রহিতকারী। এটা অন্য সকল শরীয়তের তুলনায় অধিক সহজ ও সহনীয়। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

"احب الاديان الي الله الحنيفية السمحة "

“আল্লাহর নিকট সবচে প্রিয় দ্বীন হলো সহজাত ধর্মমত।”[৩১]

এরপরেও কি করে অন্য পথ ও পন্থা এর চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ হতে পারে? অথচ হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

“...শপথ সেই সত্তার, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মূসা ﷺ আজ জীবিত থাকতেন। তোমরা তাকে অনুসরণ করতে আর আমাকে ছেড়ে দিতে। তাহলে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হতে।”

আল্লাহ তা’আলা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়ে এই উম্মাতের উপর অনুগ্রহ করেছেন। এবং উম্মাতের উপর তাঁর নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। আর এসব হয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম।" (সূরাহ মাইদা ৫:৩)

আল্লাহ যা আমাদের জন্য পছন্দ করেছেন, মনোনয়ন করেছেন, আমরাও তা পছন্দ করলাম। মেনে নিলাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে

---

[৩০] ইমাম আহমাদসহ আরও অনেকেই হাদীসটি গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন। হাদীসটির সনদে 'মুজালিদ বিন সা'দ' নামের এক ব্যক্তি আছেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ—এর বক্তব্য হলো, লোকটি নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, ইবনু মাহদীসহ আরও অনেক মুহাদ্দিস বলেন, তার বর্ণনাগুলো দুর্বল।

[৩১] ইমাম বুখারি হাদীসটি তার সংকলিত 'আদাবুল মুফরাদে' (২৮৭) উল্লেখ করেছেন। তিনি হাদীসটি সহিহ হওয়ার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী 'ফাতহুল বারী'র প্রথম খন্ডের ৯৭ নং পৃষ্ঠায় ইবনু আব্বাস ﷺ —এর সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করে তাকে 'হাসান' পর্যায়ের বলেছেন।

ভালোবাসেন। পছন্দ করেন। এবং শ্রেষ্ঠ নবীর মাধ্যমেই তা দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَٰمُ

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম।" (সূরাহ আলে ইমরান ৩:১৯)

তিনি ইরশাদ করেন,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْءَاخِرَةِ مِنَ الْخَٰسِرِينَ

“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (সূরাহ আলে ইমরান ৩:৮৫)

সুতরাং এতকিছুর পরেও যে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো পথ, মত ও শরীয়তের তালাশ করবে—সে কাফিরদের দলভুক্ত।

দ্বিতীয় মাস'আলা: দ্বিতীয় মাস'আলা হলো, “....অথবা যে বিশ্বাস করে মুহাম্মাদ ﷺ -এর আনীত আইনের চেয়ে অন্যের বানানো আইন অধিক উত্তম। অধিক শ্রেষ্ঠ...”

তাহলে সকল আলিমের ঐক্যমতে সে কাফির! সুতরাং যারা তাগুতপ্রণীত আইন এবং শাসনব্যবস্থাকে ইসলামি আইন ও শাসনব্যবস্থার চেয়ে অধিক উত্তম মনে করে—তারা কাফির। কেননা তারা তাদের মত কিংবা তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষের প্রণীত বিধানকে সেই রাসূলের বিধানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়—যাকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসীর মুক্তিদূত ও পথপ্রদর্শক করে প্রেরণ করেছেন—যাতে তিনি মানুষকে আঁধার থেকে আলোতে, অশান্তির অনল থেকে শান্তির অঙ্গনে নিয়ে আসেন! আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الٓر ۚ كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“আলিফ-লাম-র, একটা কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে নিয়ে আসতে পার আলোর দিকে- মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিতের পথে।" (সূরাহ ইবরাহীম ১৪:১)

প্রতিটা মুসলিম এবং মুসলিমাহ্‌র জন্য উচিৎ অন্যসব মত ও মতবাদ, তন্ত্র ও মন্ত্র সম্পর্কে ধারণা নেয়ার আগে ইসলামি আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা। তাহলে মানুষ আজ যে ভয়াবহ ফিতনার মধ্যে আছে—তাতে পতিত হবে না। তা না হলে অন্যসব মত ও মতবাদকে ইসলামের মতবাদ ও আইনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রদত্ত আইনের বিপরীতে (জেনেশুনে, ইসলামের বিরুদ্ধাচারের নিমিত্তে) বিচার চাইবে বা করবে, রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সে কাফির। যেমনটি আল্লাহ্‌ পাক সূরা নিসাতে বলেছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

"তুমি কি সেই লোকেদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের এবং তোমার আগে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে বলে দাবি করে, কিন্তু তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়। যখন তাদেরকে বলা হয়- তোমরা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাবের এবং রসূলের দিকে এসো, তখন তুমি ঐ মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমা হতে ঘৃণা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।" (সূরাহ্‌ নিসা ৪:৬০-৬১)

এক পর্যায়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।" (সূরাহ্‌ নিসা ৪:৬৫)

আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই শপথ করে বলছেন, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) মুমিন হতে পারবে না—যতক্ষণ না তিনটি বিষয় পরিপূর্ণরূপে আমল করবে।

১) সকল বিষয়ে রাসূল ﷺ- এর ফায়সালা মেনে নেবে।

২) রাসূলের সিদ্ধান্তের পর অন্তরে কোনো ক্ষোভ থাকবে না।

৩) তাঁর ফায়সালার কাছে নিজেকে সর্বতভাবে সমর্পণ করবে।

একজন বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ মানুষ কি করে এতে সন্তুষ্ট হতে পারে যে, তার উপর আল্লাহ প্রদত্ত বিচারব্যবস্থা- যা তাঁর রাসূল ﷺ- এর উপর নাযিল করেছেন—যাতে তিনি মানুষকে আঁধার থেকে আলোতে আনতে পারেন—সেটা বাদ দিয়ে মানুষ প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থা প্রয়োগ করা হচ্ছে, যাদের চিন্তাশক্তি দুর্বল, মেধা ক্ষীণ ও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ!

এমনকি মানুষ প্রবর্তিত বিধানের ভিত্তি হলো অন্যায় ও বেইনসাফির উপর। অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ এর উপর!

একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখুন—ঐ সকল রাষ্ট্র ও তার অধিবাসীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে? তাদের জীবন এখন কেমন কাটছে? যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিচারব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে গিয়ে গ্রহণ করেছে মানবপ্রণীত আইন। আজ তাদের স্বভাব হলো জুলুম! তাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত পাপ, পঙ্কিলতা, অন্যায়, অনাচার! তাদের মন আজ স্বাধীনতা চায়! অথচ এসব তাদের কাছে নিকৃষ্ট বা নিন্দনীয় নয়। তাদের শৈশব কাটে এসবের উপর। এর উপরেই আসে তাদের বার্ধক্য! একটা পর্যায়ে আল্লাহ প্রদত্ত তাদের পবিত্র ফিতরাত বদলে যায়। ফলে তারা পশুর মত জীবনযাপন করে। এভাবেই চলছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান ত্যাগকারীদের জীবন!

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَٰفِرُونَ

"আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির।" (সূরা মায়িদা: ৪৪)

আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা, রাসূলের আনীত শাসন ব্যবস্থাকেই অন্য সব শাসনব্যবস্থার চেয়ে অধিক উত্তম ও উপযোগী হিসেবে বিশ্বাস করা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর অন্যতম দাবি। অতএব, যে মনে করে রাসূলের আনীত মতবাদের চেয়ে অন্য কোনো মতবাদ শ্রেষ্ঠ, তাহলে সে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"-এর মর্মই বুঝেনি। বরং তার উল্টোটা বুঝেছে। কেননা আনুগত্য ও আত্মসমর্থন করা এই পবিত্র বাক্যের শর্তসমূহের একটি। যে পবিত্র বাক্যের উপর আসমান ও জমিন টিকে আছে। যার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ! কিতাব অবতারণ! এবং জিহাদকে শরীয়ত সম্মতকরণ! এই বাক্যের ভিত্তিতেই মানুষ দুই দলে বিভক্ত; সৌভাগ্যবান এবং দুর্ভাগ্যবান। যে ব্যক্তি কালিমাহর মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে, তাঁর যাবতীয় শর্ত ও রুকন পরিপূর্ণরূপে

মেনে চলেছে, সে অন্যসব মন্ত্র, তন্ত্র ও মতবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে।

অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিশেষত বর্তমান সময়ে—যেটাকে দুই নবীর অন্তর্বর্তীকালের সাথে তুলনা করা যায়। এসময়ের মানুষরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা ও বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে ইহুদি-নাসারাদের চিন্তা ও গবেষণার ছায়াতলে সমবেত হয়েছে! যারা

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً

অর্থাৎ *"কোন ঈমানদার ব্যক্তির ব্যাপারে তারা না কোন আত্মীয়তার মর্যাদা দেয়, আর না কোন ওয়াদা-অঙ্গীকারের।"* চিন্তা চেতনাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে!

আল্লাহু আকবার! আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ তাঁর 'নূনিয়্যাহ' কিতাবে আবৃত্তি করে বলেন,

> আরে! কুফর তো হলো ওমুক-তমুকের কথায় নবী ﷺ-এর আনীত দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করা
> এই মহান দ্বীনের সাথে চরম গুয়ার্তুমি করা
> ভেবে দেখো, হতে পারে তুমিও ঐ ব্যাক্তির চেয়ে জঘন্য ও নিম্নতর
> যে ওমন কাজ করে ও বলে...

তাহলে তো তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে!

সকল অভিযোগ আল্লাহর কাছে। সাহায্যও তাঁর নিকটে। ভরসা তাঁর উপরেই। তিনি ছাড়া কোনো শক্তি আর সামর্থ্য নেই!

আমরা এতক্ষণ যা বলে আসলাম, তাতে এমন কথাও অন্তর্ভুক্ত হবে, যে কেউ বলল- "বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পস্তরাঘাতে হত্যা করা, চুরির অপরাধে হাত কেটে দেয়া, বর্তমান যুগের জন্য উপযোগী নয়। আমাদের যুগ আর রাসূলের যুগের মাঝে, এবং আমাদের রাষ্ট্র আর আরব রাষ্ট্রগুলোর মাঝে অনেক ব্যবধান! অনেক পার্থক্য! আমাদের এই সময়ে তা অনুপযোগী! অনর্থক"!

এসকল ধর্মচ্যুতদের বিশ্বাস- বর্তমান সময়ের জন্য রাসূলের রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বর্তমান সময়ের লোকদের প্রবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা অধিক উত্তম!

অনুরূপ ঐ কথাও অন্তর্ভুক্ত, কেউ বলল- "এই যুগের জন্য আল্লাহর প্রেরিত বিধানের বিপরীত বিধান বাস্তবায়ন জায়েয আছে।" নাউজুবিল্লাহ! এমন বক্তাও

কাফির। কেননা সে হারামকে হালাল, আর হালালকে হারাম হওয়ার বৈধ জ্ঞান করে।

আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

ঈমান ভঙ্গের পঞ্চম কারণ

দ্বীন ইসলামের কোন বিষয়ে বিদ্বেষ পোষণ করা

লেখক বলেন,

"...যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত দ্বীনের কোন একটি বিষয়ে বিদ্বেষ পোষণ করল, সে কাফির হয়ে গেল। যদিও সে তার উপর আমল করে।"

এ ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। "আল-ইকনা'উ" কিতাবের লেখকসহ আরও অনেকেই এমনটি বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর আনীত দ্বীনের কোন একটি বিষয়কে ঘৃণা করা, চাই সেটা কথা কিংবা কর্ম বিষয়ক হোক—তা সুস্পষ্ট মুনাফিকি বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। যাদের অবস্থান জাহান্নামের পাতাল দেশে।

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত ধর্মের কোনো একটি বিষয়ে ঘৃণা করে—সে বড়ই খতরনাক অবস্থায় রয়েছে। হোক সেটা আদেশ সূচক কিংবা নিষেধ মূলক!

পশ্চিমা মদদপুষ্ট কিছু নাস্তিক রয়েছে—তাদের লেখালেখিতে এরকম অসংখ্য কুফরি কথা বিদ্যমান। তারা একাধিক বিবাহের বিধানকে ঘৃণা করে। এর দ্বারা মূলত তারা ইসলামের বাহুডোর থেকে বেরিয়ে গেছে। বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে একাধিক বিয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে। অথচ এরা জানে না—এদের এ অভিযান স্বয়ং আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে! তারা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে অভিযোগ তুলছে!

এরকম আরও একটি কুফরি বিষয় হলো 'সমষ্টিগতভাবে নারীরা পুরুষদের সমপর্যায়ের নয়'[৩২] ইসলামের এই বিধানকে অস্বীকার করা, এটাকে বৈষম্য বলে মনে করা। যেমন নাকি নারী হত্যার মুক্তিপণ পুরুষ হত্যার মুক্তিপণের অর্ধেক[৩৩],

---

[৩২] এখানে তিনটি বিষয়— মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব। মর্যাদায় আল্লাহর কাছে নারী-পুরুষ সমান। তারতম্য হবে তাকওয়া ও আমালে সালিহার ভিত্তিতে। অধিকারের দিক থেকে তো ইসলাম নারীকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রায়োরিটির সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছে। বাকি রইল দায়িত্ব কিংবা নেতৃত্ব। এক্ষেত্রে পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা আগে রেখেছেন। কেননা সৃষ্টিগতভাবেই নারীর তনু-মন নরম, কোমল, আবেগপ্রবণ।— অনুবাদক

[৩৩] ভুলবশত কোনো পুরুষ হত্যা করলে হত্যাকারীর যা মুক্তিপণ আসে, একজন নারীকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য মুক্তিপণ তখন তার অর্ধেক হয়ে যায়। কারণ, এই মুক্তিপণ কিন্তু নিহত ব্যক্তি পাচ্ছে না। পাচ্ছে তাদের রেখে যাওয়া আত্মীয়স্বজন। তো একজন পুরুষের অধীনে অনেক লোক থাকে। অনেক সদস্যের চাহিদা, ভরণপোষণ ও সাংসারিক দাবি তার মিটাতে হয়। কখনো তো একজন পুরুষের মৃত্যুতে একটি পরিবার একেবারে কোমর ভেঙে পড়ে। পথে বসার উপক্রম হয়। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। তার ভরণপোষণ অন্যজনের দায়িত্বে। অন্যের দায়িত্ব কিন্তু তার উপর নেই। তাই তার আত্মীয়স্বজনদের জন্য এই অর্ধেকই তো অনেক! আর এটা ইসলামের

দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান[৩৪], এরকম আরও কিছু বিষয় রয়েছে, যা তারা অপছন্দ করে।

> একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল ﷺ ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, 'হে নারী সমাজ! তোমার সাদাকাহ করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক।' তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কারণে হে আল্লাহ্‌র রাসূল?' তিনি বললেন, 'তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদা সতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চেয়ে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি।' তারা বললেন, 'আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, হে আল্লাহ্‌র রসূল?' তিনি বললেন, 'একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়?' তারা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন, 'এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়েজ অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না?' তারা বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি।'

হাদীসটি বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে। যা আবু সাইদ খুদরী ؓ বর্ণনা করেছেন।[৩৫]

আপনি দেখে থাকবেন, তারা এই পবিত্র হাদীসের উপর প্রশ্ন তুলে। যবানকে দরাজ করে বলে, 'হাদীসটি যেহেতু বিবেক বিরোধী এবং বাস্তবতা বিবর্জিত—তাই তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ কিংবা দুর্বল।' আসলে এসব মূলত হাদীসটির প্রতি তাদের মনের খুঁতখুঁত আর ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ।

এরা কাফির। যদিও এরা নস দ্বারা প্রমাণিত অন্য সব বিষয়ের উপর আমল করে। তারা তো "لا إله إلا الله" এর শর্ত পরিপূর্ণ করতে পারেনি। কেননা তার শর্তসমূহের

সমবন্টন। বেইনসাফি কিংবা বৈষম্য নয়। কেননা যদি তা বৈষম্যই হতো, তাহলে কিসাস তথা 'হত্যার বদলায় হত্যার' বিধানে নারী-পুরুষের তারতম্য করা হত। সেখানে কিন্তু এমনটা করা হয়নি।— অনুবাদক

[৩৪] ইসলামের বিধান হলো নারী পর্দা করবে। ঘরে থাকবে। ঘর সামলাবে। পুরুষ জীবিকা আয় করবে। বাহিরে যাবে বাহির সামলাবে। তাই যে কোনো প্রেক্ষাপটে, ঘটনার প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় পুরুষই বেশি উপস্থিত থাকে। তাই যুক্তির দাবিই হলো সাক্ষী পুরুষ হওয়াই অধিক উপযুক্ত। ব্যাপারটা যদি বৈষম্যই হয় তাহলে কুমারি , ইদ্দত, পিরিয়ড কিংবা একান্ত নারীর সাথে সংশ্লিষ্ট মামলায় 'নারীর সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য' মর্মে ইসলামে কোনো মূলনীতি বা আইন প্রণয়ন হতো না। মেয়েদের জ্ঞান অর্ধেক (এটা তো আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেই ছেড়েছে। তা ছাড়া স্রষ্টা (আল্লাহ) যেটা যেমন করেছেন, রাসূলকে দিয়ে সেটা প্রকাশ করেছেন, তার উপর প্রশ্ন তোলাটা কি হাস্যকর না?) তবে মনে রাখতে হবে, ব্রেইন আর বুদ্ধি এক না। হাদীসে عقل (বিবেক—বুদ্ধি) শব্দের ব্যবহার এসেছে।— অনুবাদক

[৩৫] সহিহ বুখারি-৩০৪

মধ্যে রয়েছে—কালেমা যা সত্যায়ন করে তার উপর মুহাব্বাত রাখতে হবে। তা পেয়ে আনন্দিত হতে হবে। এবং তার প্রতি অন্তর প্রশস্ত রাখতে হবে।

অথচ এসকল লোকদের বক্ষ সংকীর্ণ। বক্রতায় পূর্ণ। পবিত্র কালিমা যা সমর্থন করে, তারা তা অপছন্দ করে। যা দাবি করে, তারা তা অস্বীকার করে। এটা সুস্পষ্ট মুনাফিকি স্বভাব। মুনাফিকদের কর্ম। মুনাফিকরা প্রকাশ্যে খুব ইবাদাত করত। ইসলামের সকল আদেশ মানত। কিন্তু মনে মনে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত।

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ خالِصًا مُخْلِصًامن قَلْبِهِ ؛ دخل الجنة

"যে ব্যক্তি একনিষ্ঠচিত্তে বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৬]

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ কোনো বিধিবিধান অপছন্দ করে, এবং এর বিরুদ্ধে কুফরি আইন বাস্তবায়ন করে, তার ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"যারা কুফরী করে তাদের জন্য দুর্ভোগ আর তিনি তাদের কর্মকে বিনষ্ট করে দেবেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, কাজেই আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৮-৯)

যারা কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, এর আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলবে, তাঁদের জন্য আল্লাহ্ কুরআনকে বানিয়েছেন কল্যাণ ও সফলতার চাবিকাঠি। অতএব, যারা এই কুরআনের প্রতি ঘৃণা রাখবে, তিনি তাদের সকল আমল বাতিল করে দিবেন। ধূলিকণায় পরিণত করবেন।

যে কেউ আল্লাহর বিধানকে অপছন্দ করবে, অযৌক্তিক জ্ঞান করবে, তার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। যদিও সে অপছন্দ ও ঘৃণা সত্ত্বেও তার উপর আমল করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

---

[৩৬] মুসনাদে আহমাদ- ৫/২৩৬; ইবনু হিব্বান- ১/৪২৯
হাদীসটি জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থেকে আমর ইবনু দীনার, তাঁর থেকে সুফয়ান রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহিহ।

"এর কারণ এই যে, তারা তারই অনুসরণ করে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আর তারা তাঁর সন্তোষকে অপছন্দ করে, ফলে তিনি তাদের সমস্ত 'আমাল নষ্ট করে দিয়েছেন।" (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭:২৮)

এটি খুবই ভয়ানক একটি বিষয়, যা প্রতিটি মুসলিমকে শঙ্কিত করে রেখেছে। না জানি—কখন তার দ্বারা শরীয়তের কোনো ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। সম্ভাবনা আছে কখনো এই অবজ্ঞা অন্তরেও উঁকি দিতে পারে। খুব সূক্ষ্মভাবে। যা মানুষের জীবনের একটা দীর্ঘ সময় অতিক্রম হওয়ার পরেই টের পাওয়া যায়। তাই আমাদের জন্য উচিৎ খুব বেশি বেশি এই দু'আ পড়া,

يا مقلب القلوب! ثبت قلبي علي دينك

"হে অন্তরসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল রাখুন।"

কেননা অন্তরসমূহ দয়াময় আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে। তিনি যেভাবে চান, সেভাবেই নাড়াচাড়া করেন।

এই বিষয়টিতে আমাদের খুব সতর্ক থাকা উচিৎ। এমন অনেক মানুষ আছে, যখন তার সামনে আপনি শরীয়তের কোনো গুনাহের কথা তুলে ধরবেন—তখন সে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে। আপনি যা বলবেন—তা মানবে না। বিশেষ করে যখন সে ঐ পাপ কাজটিতে লিপ্ত! তবে একথা বলা যাবে না যে—সে রাসূল ﷺ-এর আনীত দ্বীনের কোনো বিষয়কে অবজ্ঞা করছে। কেননা হতে পারে, সে সত্যটা গ্রহণ করছে না—আপনি বলছেন বলে। অথবা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধে আপনার উপস্থাপনা, বলার ভঙ্গিমা সুন্দর নয় বলে। অমান্য করার কারণ এই না যে—এটা ইসলামের বিধান! যদি আপনি না হয়ে অন্য কেউ হত, তার সামনে শরীয়তের মন্দটা তুলে ধরতো—তাহলে হয়তো সে তা গ্রহণ করত। অনুসরণ করত। কিংবা হতে পারে আপনার আর তার মাঝে কোনো মনোমালিন্য আছে! সুতরাং তাকে বলা যাবে না যে—সে ইসলামের কোনো বিষয়ের অবজ্ঞাকারী!

এখানে আরও একটি সতর্কতার ব্যাপার হলো—অনেক লোক এমন আছে, কাউকে নিয়মিত প্রকাশ্যে গুনাহ করতে দেখলেই এই থিউরির আওতাধীন মনে করে। যেমন কেউ দাড়ি কাটে, টাখনুর নীচে কাপড় পরে, কিংবা মদ পান করে। তো বলে দেয় এই ব্যক্তি কাফির। এ ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অবজ্ঞাকারী! কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা দাড়িকে ছেড়ে দাও..., টাখনুর উপর কাপড়

পর..., মদ পান থেকে বিরত থাকো...।' এরপর বলে, যদি সে রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহকে অবজ্ঞা না করত—তাহলে এসব পাপকর্মে লিপ্ত থাকতো না।

এই ধরণের অভিযোগ অগ্রহণযোগ্য। সাহাবাদের যুগেও এমন কিছু মুসলিম ছিল, যারা গুনাহে লিপ্ত থাকতেন। যেমন—মদপান করা। কিন্তু কোনো সাহাবি কাউকে এজন্যে এই ধরণের 'লকব' লাগাননি। বরং প্রসিদ্ধি আছে একবার এক মদ্যপায়ীকে রাসূল ﷺ -এর দরবারে আনা হল। তখন এক সাহাবি বললেন, 'তোর উপর আল্লাহর লা'নত! কতবার তোকে এই অপরাধের জন্য ধরে আনা হয়েছে।' প্রিয়নবী ﷺ ঐ সাহাবাকে অভিসম্পাত করতে বারণ করে বললেন, "নিশ্চয় সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে।"[৩৭]

এই ধরণের অভিযোগ করা মানে "কবিরা গুনাহ করলে মানুষ আর মুসলিম থাকে না" এই কথায় বিশ্বাস করা। যা সুস্পষ্ট আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা বিরোধী। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো—কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে ক্ষমা করে দিবেন। চাইলে পাপ পরিমাণ শাস্তি দিবেন। তবে আখেরাতে তার সর্বশেষ আবাস্থল হলো জান্নাত।

---

[৩৭] বুখারী ৬৭৮০
(উমার ইবনু খাত্তাব ﵁ বলেন, নবী ﷺ এর যুগে এক লোক যার নাম ছিল 'আবদুল্লাহ্ আর ডাকনাম ছিল হিমার। এ লোকটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হাসাত। রসূলুল্লাহ্ ﷺ শরাব পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। রসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে চাবুক মারার আদেশ দিলেন। তাকে চাবুক মারা হল। তখন দলের মাঝ থেকে এক লোক বলল, হে আল্লাহ্! তার উপর লা'নত বর্ষণ করুন! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার যে আনা হল! তখন নবী ﷺ বললেন— তাকে লা'নত করো না। আল্লাহ্র কসম! আমি জানি যে, সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসে।)— অনুবাদক

contents

ঈমান ভঙ্গের ষষ্ট কারণ

দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করা

লেখক বলেন,

"...যে ব্যক্তি দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে; প্রতিদান কিংবা পরিণাম নিয়ে ঠাট্টা-মশকারা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।" আল্লাহ বলেন,

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা জোর দিয়েই বলবে, 'আমরা হাস্য রস আর খেল-তামাশা করছিলাম।' বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছ..." (সূরাহ তাওবা ৯:৬৫-৬৬)

রাসূল ﷺ-এর আনীত দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা কুফরি। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। যদিও বিদ্রুপ করা নিয়্যাত না নয়—শুধুমাত্র মজা করার উদ্দেশ্য হয়।

শাইখ ইবনু জারীর, ইবনু আবি হাতিম, আবু আশ-শায়েখসহ আরও অনেকেই আব্দুল্লাহ ইবনু উমার رضي الله عنه থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার رضي الله عنه বলেন,

"তাবুক যুদ্ধে এক বৈঠকে জনৈক ব্যক্তি বলল, আমাদের এসব ক্বারীদের (সাহাবিদের) মত অধিক পেটুক, অধিক মিথ্যুক এবং শত্রুদের সাথে মুখোমুখির সময় এরূপ কাপুরুষ আর দেখিনি।"

তখন এক সাহাবি বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ! তুমি একজন মুনাফিক। অবশ্যই আমি এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছার পূর্বেই এ আয়াত নাযিল হয়। ইবনু উমার رضي الله عنه বলেন, আমি লোকটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উটনীর লাগাম ধরে পাথরের সাথে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলতে দেখেছি। তখন সে বলছিল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এসব কথা দ্বারা খোশগল্প ও খেল-তামাশা করছিলাম। তখন রাসূল ﷺ এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

"তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা জোর দিয়েই বলবে, 'আমরা হাস্য রস আর খেল-তামাশা করছিলাম।' বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে?" (সূরাহ তাওবা ৯:৬৫)

তাদের কথা, "আমরা হাস্য রস আর খেল-তামাশা করছিলাম" অর্থাৎ আমরা বিদ্রুপ করার নিয়্যাতে এমনটা করিনি! ব্যাপারটাতে আমরা সিরিয়াস না। শুধু মজা নিচ্ছিলাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমরা রাস্তা অতিক্রম করার জন্য এসব কথা বলছিলাম। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের 'কাফির' ঘোষণা দিয়েছেন। কেননা, ইসলাম এমন একটি বিষয়—যা নিয়ে কোনো হাসি-ঠাট্টা হতে পারে না। মজা কিংবা ব্যঙ্গ করা চলে না। এসব বাক্যব্যয়ের কারণে তারা কাফির হয়ে গিয়েছে। অথচ একটু আগেও তারা মুমিন ছিল!

অনেকে বলেন, 'তারা শুরু থেকেই অন্তরে কুফুরি লালন করত, এরপর মুখে ঈমানের দাবি করে ফের কাফির হয়ে গেছে।' শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷫ তাদের এই মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, "অন্তরে কুফরি রেখে মুখে ইসলামের দাবি করলেও সে কাফির থেকে যায়। যদি তাই হত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা বলতেন না,

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"তারা কুফরি করেছে ঈমান আনার পরে।" (সূরাহ তাওবা ৯:৬৬)

তার মানে তারা আগ থেকেই কাফির ছিল না!"[৩৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে মশকরা করবে, যেমন কুরআন-সুন্নাহর ইলম কিংবা তার ছাত্রদের (তালিবে ইলম) অবজ্ঞা করা, আল্লাহর প্রতিদান ও পরিণাম নিয়ে মজা করা, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার কারণে কাউকে উপহাস করা, যেমন-সালাত নিয়ে নানান ধরনের মন্তব্য করা হয়, হোক সেটা নফল কিংবা ফরয সালাত। অনুরূপভাবে সালাত আদায় করার কারণে কাউকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করা, দাড়ি রাখার কারণে অথবা সুদ না নেওয়ায় কারণে মজাক উড়ানো, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে হাসি মজাক করা সুস্পষ্ট মুনাফিকের আলামত। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

---

[৩৮] ইবনু তাইমিয়্যাহ তার 'ঈমান' নামক গ্রন্থের ২৭৩ নং পৃষ্ঠায় এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "আয়াতটি প্রমাণ করে তারা কুফরি হিসেবে এমনটি করেনি। বরং তাদের ধারণা ছিল এটা কুফরি নয়। আয়াত নাযিল হওয়ার পর জানা গেল যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে উপহাস করা এমন কুফরি, যার দ্বারা মানুষ ঈমান আনার পরেও কাফির হয়ে যায়। তবে হ্যা, এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, তাদের ঈমান খুব দুর্বল ছিল। আর তারা যা করেছে, তা হারাম জেনে করেছে, কুফরি ভেবে নয়। এবং জায়েয মনে করেও নয়।

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত। এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত, নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস করছে। সিংহাসনে বসে, তাদেরকে অবলোকন করছে, কাফিররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?" (সূরাহ মুতাফফিফিন ৮৩:২৯-৩৬)

দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করার ব্যাপারটিকে অনেক আলিম দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৩৯]

১) সুস্পষ্ট বিদ্রুপ। যেমনটি আয়াতে বলা হয়েছে। এবং তাদের কথা– "আমরা আমাদের এই কারীগণের (সাহাবাগণ) মত অধিক পেটুক, কথায় মিথ্যুক আর লড়াইয়ের ময়দানে কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি" অথবা এই জাতীয় কোন কথা।

২) অস্পষ্ট বিদ্রুপ। এটাতো এমন এক সমুদ্র যার কোন কূল কিনারা নেই। যেমন কু'রআন তেলাওয়াত বা হাদিস পাঠের সময় কিংবা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদানকালে চোখের ভুরু নাচানো, জিভ বের করে ভেংচি কাটা, ঠোঁট উল্টানো, হাতের অঙ্গভঙ্গি করা।

প্রত্যেক মুসলিমের উচিত দ্বীনের বিদ্রুপকারীদের বয়কট করা। সকল প্রকার লেনদেন, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়। তাদের সাথে ওঠাবসা করবে না। কথাবার্তা বলবে না। যাতে করে সে তাদের মতোই না হয়ে যায়। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

---

[৩৯] মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব তার 'হুকমুল মুরতাদ' এর ১০৫ নং পৃষ্ঠায়; হাম্মাদ বিন আতিক তাঁর মাজমু'আতুত তাওহীদ' এ এই প্রকারের কথা বর্ণনা করেছেন।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَٰفِقِينَ وَالْكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

"কিতাবে তোমাদের নিকট তিনি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতের প্রতি কুফরি হচ্ছে এবং তার প্রতি ঠাট্টা করা হচ্ছে, তখন তাদের নিকট বসো না যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত না হয়, নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে, নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" (সূরাহ নিসা ৪:১৪০)

কেউ যদি দেখে যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করছে, তা নিয়ে হাসি মজাকে মেতে আছে, তথাপি তাদের সাথে বসে তাদের কর্মে, তাদের কথায়, তাদের আড্ডায় সন্তুষ্ট থাকে তো সেই ব্যক্তি গোনাহ এবং কুফরীতে তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামে থেকে বহিস্কৃত। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

"(হুকুম দেয়া হবে) 'একত্র কর যালিমদেরকে আর তাদের সঙ্গীদেরকে এবং তাদেরকেও, যাদের তারা 'ইবাদাত করত।" (সূরাহ আস-সফফাত ৩৭:২২)

অর্থাৎ তারা তাদের মতই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঈমান ভঙ্গের সপ্তম কারণ

কিছু অর্জন কিংবা বর্জনের জন্য যাদু করা (ব্ল্যাক ম্যাজিক), যাদুর উপর সন্তুষ্ট থাকা, মনে প্রাণে যাদুকে পছন্দ করা।

লেখক বলেন,

“... যাদু (ব্লাক ম্যাজিক) করা। الصرف তথা ফিরিয়ে রাখা। এবং العطف তথা মিলিয়ে দেয়া। এগুলোও যাদুর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে যাদু করল কিংবা যাদুর উপর সন্তুষ্ট থাকল, (মনেপ্রাণে) যাদুকে পছন্দ করল, সে কাফির! প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আয়ালার কথা,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

> “... তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু’জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (যাদু) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না...” (সূরাহ বাক্কারাহ ২:১০২)

আভিধানিকভাবে ‘যাদু’ বলা হয় এমন গোপনীয় কোনো কিছু করা—যার সূত্র বা পদ্ধতি অস্পষ্ট, গুপ্ত ও সূক্ষ্ম।

এই কারণেই কোনো বিষয় যখন খুব বেশি গোপনীয় হয়, তখন আরবরা বলে, اخفي من السحر অর্থাৎ জাদুর চেয়ে অধিক অস্পষ্ট।

কবি মুসলিম ইবনুল ওয়ালিদ আল আনসারি বলেন,

جعلت علامات المودة بيننا +مصائد لحظ هن اخفي من السحر

فاعرف منها الوصل في لين طرفها +واعرف منها الهجر في النظر الشزر

> *“নারীর সোহাগি চাহনিকে তুমি আমাদের মাঝে ভালোবাসার ফাঁদ ও নিদর্শন বানিয়েছ; যা যাদুর চেয়েও সূক্ষ্ম; সুতরাং আমি বুঝি নারীর চিত্তাকর্ষক চাহনিতে প্রেমের আবেদন! আর রূঢ় চাহনিতে অবজ্ঞা”*

শরীয়তের পরিভাষায় যাদু হলো এমন মন্ত্র, গিঁট কিংবা ঝাড়ফুঁক, যার সাহায্যে যাদুকর শয়তানদের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাদের সাহায্য চায়, যেন তারা যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করে।

এছাড়াও এর আরও অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। তবে আল্লামা শানকীতি ﵀-এর অভিমতটি সুন্দর। তিনি বলেন, “যাদুকে পরিপূর্ণ ও নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞায় সংজ্ঞাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কেননা তার ধরণ, পদ্ধতি ও প্রকার অনেক।

ফলে এক কথায় তার প্রকাশ দুঃসাধ্য। আর এ কারণেই যাদুর সংজ্ঞায় আলিমগণের বক্তব্য ও অভিমতে ভিন্নতা এবং বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে।[৪০]

যাদুর আরও একটি দিক হলো- الصرف অর্থাৎ ফিরিয়ে রাখা। এবং العطف অর্থাৎ মিলিয়ে দেওয়া।

ফিরিয়ে রাখা: মানুষ যা পছন্দ করে, কামনা করে, মনে প্রাণে চায়—সেখান থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখা। যেমন—স্ত্রীর মুহাব্বাত থেকে ফিরিয়ে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা।

মিলিয়ে দেওয়া: এটাও আগেরটার মতোই এক প্রকার যাদুকর্ম। কিন্তু এটার কাজ হলো মানুষ যা অপছন্দ ও ঘৃণা করে—শয়তানি পদ্ধতিতে তার প্রতি মুহাব্বাত ও ভালোবাসা তৈরি করা।

যাদু বা ব্লাক ম্যজিক সকল নবীর শরীয়তে হারাম ছিল।

যাদু সম্পর্কিত বেশ কিছু মাসআলা রয়েছে। আমরা সেগুলো আলিমগণের মতামতের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। কেননা এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং তা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে।

প্রথম মাস'আলা

যাদু বা ব্লাক ম্যাজিকের কি কোনো বাস্তবতা আছে?

হ্যা, এর বাস্তবতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمِن شَرِّ النَّفَّـٰثَـٰتِ فِي الْعُقَدِ

> "এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে।" (সূরাহ ফালাক ১১৩:৪)

যদি তার বাস্তবতা না থাকত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আদেশ করতেন না।
অনুরূপভাবে আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ,

---

[৪০] আযওয়াউল বায়ান: ৪/৪৪৪

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

"... তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (যাদু) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর। এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করত, যদ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করত..." (সূরাহ বাক্বারাহ ২:১০২)

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে—যাদু সত্য। এবং তা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে থাকে।

এ ছাড়াও যাদু যে বাস্তব তার আরও দলিল রয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন আইশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন,

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর যাদু করা হয়। এমনকি তাঁর মনে হতো তিনি কোন কাজ করেছেন, অথচ তা তিনি করেননি। শেষে একদিন তিনি যখন আমার নিকট ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট বার বার দু'আ করলেন। তারপর ঘুম থেকে জেগে বললেন, 'আইশা! কিছু বুঝলে? আমি যে বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তিনি তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।' আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল! তা কী? তিনি বললেন, 'আমার নিকট দু'জন লোক এলেন। তাঁদের একজন আমার মাথার নিকট এবং আরেকজন আমার পায়ের নিকট বসলেন। তারপর একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই লোকটির কী ব্যথা? কী হয়েছে তাঁর? অপর জন বললেন, 'তাঁকে যাদু করা হয়েছে।' 'কে তাঁকে যাদু করেছে?' দ্বিতীয় জন বললেন, 'লাবীদ ইবনু আ'সাম নামক ইয়াহূদী।' 'যাদু কী দিয়ে করা হয়েছে?' 'চিরুনী, চিরুনী আঁচড়াবার সময় উঠে আসা চুল ও নর খেজুর গাছের 'জুব' এর মধ্যে।'

তখন নবী ﷺ তাঁর সহাবিদের কয়েকজনকে নিয়ে ঐ কূপের নিকট গেলেন এবং তা ভাল করে দেখলেন। কূপের পাড়ে ছিল খেজুর গাছ। তারপর তিনি 'আইশা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার নিকট ফিরে এসে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! কূপটির পানি (রঙ) মেহেদি মিশ্রিত পানির তলানির ন্যায়। আর পার্শ্ববর্তী খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার ন্যায়।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সেগুলো বের করবেন না?' তিনি বললেন, 'না, আল্লাহ আমাকে শিফা দান করেছেন, মানুষের মধ্যে এ ঘটনা থেকে মন্দ ছড়িয়ে দিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি। এরপর তিনি যাদুর দ্রব্যগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ দিলে সেগুলো মাটিতে পুঁতে রাখা হয়।"

হাদীসটি বুখারি, মুসলিম ও ইমাম আহমাদ সহ আরও অনেকেই বর্ণনা করেছেন।[৪১]

এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত। এবং এর উপরই ইমামগণ একমত।

অনেকে দাবি করেন যাদুর কোনো বাস্তবতা নেই। ভিত্তি নেই। এটা মূলত কুরআন-সুন্নাহ বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট মু'তাযিলাদের মত। তারা তাদের দাবির স্বপক্ষে এই আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করে থাকে,

قَالَ بَلْ أَلْقُواۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ

"মূসা যাদুকরদের বলল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' (যখন তারা তাদের যাদুর রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল) তখন তাদের যাদুর কারণে মূসার মনে হল যে, তাদের রশি আর লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে।" (সূরাহ ত্ব-হা: ২০:৬৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেননি, تسعي علي الحقيقة। অর্থাৎ বাস্তবেই তা ছুটাছুটি করছিল। বরং বলেছেন—মূসার মনে হলো সেগুলো ছুটাছুটি করছে।

তারা বলে থাকেন, যাদু হলো ধোঁকাবাজি, বিভ্রান্তি, প্রতারণা ও কল্পনা। যার কোনো ভিত্তি নেই। বরং তা ছলচাতুরীর একটি প্রকার মাত্র!

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেন, "তাদের এ দাবি সাহাবা ও আসলাফগণের সুস্পষ্ট মুতাওয়াতির[৪২] বর্ণনার বিরোধী। সকল ফকিহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও আধ্যাত্মিক রাহবার একমত যে—যাদু সত্য। এবং বিচক্ষণ মানুষ মাত্রই তা স্বীকার করবেন। যাদুর কিছু প্রভাব রয়েছে, যেমন অসুখ হওয়া, ভার অনুভব করা, বুকে ব্যথা, কখনো নিজেকে হালকা অনুভূত হওয়া, গিঁট দেয়া, কথা আটকে যাওয়া, অপাত্রে ভালোবাসা তৈরি হওয়া, ঘৃণা জন্মানো, নকল বা জাল করাসহ যাদুর আরও অনেক প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আর মানুষও সেগুলোকে যাদু হিসেবেই জানে...."[৪৩]

ইমাম কুরতুবি ﷺ মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের দাবি ও দলিল উপস্থাপন করার পর উল্লেখ করেন, "এটা কোনো দলিলই না। কেননা আমরা তো অস্বীকার করছি না যে প্রতারণা, কল্পনা, ধোঁকাবাজি যাদুর একটি প্রকার! কিন্তু এর পিছনে একটা বিষয়

---

[৪১] সহিহ বুখারি, ৫৭৬৬; সহিহ মুসলিম,২১৮৭
[৪২] মুতাওয়াতির বলা হয় কোনো জিনিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা [প্রতি যুগে] এই পরিমাণ থাকা, যাঁদের মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া বিবেক অসম্ভব মনে করে
[৪৩] বাদাইউল ফাওয়াইদঃ ২/২২৭

প্রমাণিত যা বিবেক সত্য মনে করে। এবং তার বাস্তবতার ব্যাপারে যা অবতীর্ণ হয়েছে, কর্ণ তা শুনেছে। অতঃপর তিনি একটি আয়াত উল্লেখ করেন, যা যাদু ও তা শিক্ষাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

"... তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না..." (সূরাহ বাক্বারাহ ২:১০২)

যদি এর কোনো বাস্তবতাই না থাকতো, তাহলে তা শিক্ষাদান সম্ভব ছিল না। এবং আল্লাহ তা'আলা বলতেন না যে, তারা তা মানুষদের শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং যাদু একটি বাস্তব বিষয়। এবং তা প্রমাণিত।

ফির'আউনের ঘটনা বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

"তারা বড়ই সাংঘাতিক এক যাদু দেখাল।" (সূরাহ আরাফ ৭:১১৬)

সূরাহ ফালাক্ব

সকল মুফাসসির একমত যে, এই সূরাহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ঐ ইহুদি লাবীদ ইবনু আ'সামের যাদু!

অতঃপর ইমাম কুরতুবি ﷺ সহিহ বুখারি ও মুসলিমের হাদীসটি যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি—উল্লেখ করে বলেন,

"এই যাদু প্রতিক্রিয়া থেকে রাসূল ﷺ মুক্তি লাভ করার পর বললেন, 'আল্লাহ তা'আলাই আমাকে সুস্থ করেছেন।' আর সুস্থতা তো আসে উপসর্গ ও অসুস্থতা দূর হওয়ার দ্বারা। সুতরাং বোঝা গেল যাদু সত্য। এবং তার প্রমাণও অকাট্য। কুরআনের আয়াত, রাসূলের হাদীসই তার বাস্তবতা ও অস্তিত্বের সবচে বড় দলিল। এর উপরই মুসলিম উম্মাহর ইজমা। অতএব, ইমামগণের ঐক্যমত থাকা সত্ত্বেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্যুত, বিভ্রান্ত মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বিবর্জিত বক্তব্য গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই।"[৪৪]

---

[৪৪] তাফসীরে কুরতুবি, সূরাহ বাক্বারাহ ২:১০২

দ্বিতীয় মাস'আলা

যাদুকরের হুকুম কী? তাকে কাফির বলা হবে কিনা?

এব্যাপারে আলিমগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। লেখক তাঁর কিতাবে লিখেছেন—যাদুকরকে কাফির বলা হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

"... তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (যাদু) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:১০২)

এটাই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহুমুল্লাহ-সহ অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

ইমাম শাফিঈ ﵀ বলেন,

"যখন যাদুকর যাদু শিক্ষা দেয় কিংবা তা প্রয়োগ করে, তখন তাকে বলা হবে তোমার যাদুর কৌশল ও মন্ত্র কী তা বর্ণনা কর। যদি সে বর্ণনা দেয়, আর তা কুফুরিকে আবশ্যক করে; যেমন বাবেল শহরের অধিবাসীদের যাদুর মত, অর্থাৎ তারকারাজির নৈকট্যলাভের মাধ্যমে এই বিশ্বাসের সাথে করা হয় যে, তারকারাজির কাছে চাইলে সে তা করে দিবে, তাহলে সে কাফির। আর যদি সেটা কুফুরীর সীমা পর্যন্ত না পৌঁছে, কিন্তু সে তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস পোষণ করে, তাহলেও সে কাফির। কেননা সে হারামকে হালাল জ্ঞান করছে। অন্যথায় সে কাফির নয়।[৪৫]

আল্লামা শানকীতি ﵀ বলেন, "প্রকৃতপক্ষে এই মাস'আলাটি কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আর তা হলো, যদি যাদুর মধ্যে এমন কিছু থাকে, যা গাইরুল্লাহর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝায়, যেমন তারকা, জিন কিংবা এমন কিছু যা কুফরির দিকে ধাবিত করে—তাহলে নিঃসন্দেহে সে কুফরি করল। এ প্রকারের একটি হল সূরাহ

---

[৪৫] আসলে এখানে মৌলিকভাবে কোনো ইখতিলাফ নেই। অধিকাংশ আলিম তথা যারা যাদুকে কুফরি বলেন, তারা মূলত যাদুর মাঝে কোনো প্রকারভেদ করেননি। তাদের মতে যাদু মানেই শয়তানি সন্তুষ্টি, কুফরি কর্মকাণ্ড সম্বলিত সূক্ষ্ম কোনো কাজ। তাই তাদের মতে তা কুফরি। কিন্তু ইমাম শাফিঈ রহিমাহুল্লাহ যাদুর দুইটা প্রকার করেছেন। এক, যেটা কুফরির দিকে ধাবিত করে এবং গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে হয়। এ ক্ষেত্রে তিনিও কাফির বলে থাকেন। দুই, যেটা কুফরি কর্ম সম্বলিত নয়। যেমন, ভেলকিবাজি, ম্যাজিক, আইওয়াশ, হাতসাফাই ইত্যাদি। এসব মূলত চালাকি ও কৌশল। অবাস্তব এবং অসত্য। তবু যেহেতু এটা ধোঁকা, তাই এসব কুফরি না হলেও না জায়েয।— অনুবাদক

বাক্বারাহতে আলোচিত হারুত ও মারুতের যাদু। এরকম হলে নিশ্চিত সে কাফির হয়ে যাবে। যেমনটি আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

"মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:১০২)

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

"... তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (যাদু) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:১০২)

এরপর আয়াতের শেষাংশে গিয়ে বলেন,

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ فِي الْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ

"অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:১০২)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

"যাদুকর যে রূপ ধরেই আসুক না কেন, সফল হবে না।" (সূরাহ ত্ব-হা ২০:৬৯)

আর যদি যাদুকর্মটা কুফরির দিকে ধাবিত না করে। যেমন এক ধরণের বিশেষ তৈলাক্ত রং ইত্যাদি ব্যবহার করার মাধমে রুপ ধারণ করা। তাহলে সেটা সুস্পষ্ট এবং মারাত্মক পর্যায়ের গুনাহ। কিন্তু কুফরি পর্যন্ত তা পৌঁছে না।

এটাই সেই ব্যাখ্যা, যার ভিত্তিতে আলোচ্য মাস'আলায় ইমামগণ ইখতিলাফ করেছেন।"

তবে জেনে রাখা উচিত—উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ উক্তি মতে যাদুকরকে হত্যা করা ওয়াজিব। কেননা সে পৃথিবীতে অনিষ্ট সৃষ্টিকারী। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদকারী। ভূপৃষ্ঠে তার বেঁচে থাকা বিপদজনক। মানুষ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকারক। ফেতনা নির্মূল, দেশ ও মানুষের প্রশান্তি নিশ্চিত করণে যাদুকরকে

হত্যার বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে সাহাবিদের মাঝে কোনো ইখতিলাফ নেই। একটু পরেই তার বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় মাস'আলা

যাদুকর ও যাদুকারীণীকে হত্যার প্রসঙ্গে।

এ ব্যাপারে ইমামগণের ইখতিলাফ রয়েছে। তাদের থেকে মোট দুইটি অভিমত পাওয়া যায়।

প্রথম অভিমত

যাদুকরকে হত্যা করা হবে। এটাই ইমাম মালেক ﵀ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﵀ সহ অধিকাংশ আলিমদের রায়।

দ্বিতীয় অভিমত

তাকে হত্যা করা যাবে না—যতক্ষণ না তার যাদুকর্মটা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে। এটা ইমাম শাফেঈ ﵀ এর অভিমত।

প্রথম অভিমত ব্যক্তকারী আলিমরা অনেক দলিল পেশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি দলিল হলো, ইমাম তিরমিযি, আল্লামা হাকেম, ইবনু আদি, দারাকুতনি সহ আরও অনেকে ইসমাইল ইবনু মুসলিম মাক্কী থেকে, তিনি হাসান ﵀ থেকে, তিনি জুন্দুব ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, *"আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেন, 'যাদুকরের শাস্তি তরবারির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া।'*[৪৬]

ইমাম তিরমিযি ﵀ বলেন, "এই সনদটি ছাড়া আমি আলোচ্য হাদীসের আর কোন মারফু সনদ পাইনি। ইসমাইল ইবনু মুসলিম হাদীস শাস্ত্রে একজন দুর্বল ব্যক্তি। তবে জুনদুব ﵁ থেকে মওকুফ সনদে বর্ণিত হাদীসটিই অধিক সহিহ।"

আমি বলি, ইসমাইল ইবনু মুসলিম সম্পর্কে আহমাদ ইবনু হাম্বল ﵀ বলেছেন, তিনি মুনকিরুল হাদীস। তার বর্ণিত হাদীস বিবর্জিত। ইয়াহইয়া ইবনু মা'ইন ﵀ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম যাহাবি ﵀ বলেন, তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত।

তাঁরা আরও একটি হাদীসের মাধ্যমে দলিল পেশ করে থাকেন যা ইমাম আহমাদ সহ অনেকেই বিশুদ্ধ সনদে বাজালাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আমাদের নিকট উমার ﵁-এর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাঁর চিঠি আসে। সেখানে

---

[৪৬] তিরমিযি:১৪৬০

তিনি লেখেন, 'তোমরা প্রত্যেক যাদুকরকে হত্যা কর। এবং অগ্নিপূজারীদের মাঝে যারা মাহরাম তথা বিবাহ নিষিদ্ধ এমন নিকটাত্মীয়দের বিবাহ করেছে, তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দাও। আর তাদেরকে যামযামা (ইশারা-ইঙ্গিত বা গুনগুন) থেকে বারণ কর।' অতঃপর আমরা একদিনেই তিন যাদুকরকে হত্যা করেছি।"[৪৭]

হাফসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারাও তারা দলিল দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, "আমাকে আদেশ করা হয়েছে এমন দাসীকে হত্যা করার জন্য যে যাদু করে।"

এই হাদীসটি ইমাম মালেক ﵀ তাঁর 'মুওয়াত্তা মালিক' এ মুনকাতে সনদে উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ তাঁর 'মাসাইল' নামক গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকি হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদসহ উল্লেখ করেছেন। শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﵀ তার 'কিতাবুত তাওহীদ' এ হাদীসটিকে সহিহ বলেছেন।

বিশুদ্ধ মত হল, কোন ধরনের শর্ত-কথা ছাড়াই যাদুকরকে হত্যা করা হবে। এটাই সঠিক। এ ব্যাপারে কোন সাহাবি উমার ইবনু খাত্তাব, জুনদুব এবং হাফসা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম এর বিরোধিতা করেছেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদিস পাওয়া যায়। তিনি বলেন, *"আমার পর তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে আবু বকর ও উমার ইবনু খাত্তাবকে অনুসরণ কর।"* [৪৮]

তিনি বলেন, *"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হককে উমারের জবান ও অন্তরের অনুগামী করেছেন।"* হাদীসটি সহিহ।[৪৯]

যারা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত যাদুকর্মটি কুফরি পর্যন্ত না পৌঁছে, ততক্ষণ যাদুকরকে হত্যা করা যাবে না। তারা তাদের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসটির মাধ্যমে দলিল পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

"কোন মুসলিমের রক্তপাত তিনটি কারণ ছাড়া বৈধ হতে পারে না।"
১) বিবাহিত ব্যভিচারী।
২) বিনা অপরাধে হত্যাকারী।
৩) মুরতাদ।"

হাদীসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।[৫০]

---

[৪৭] বুখারির অনেক ছাপায় "প্রত্যেক যাদুকরকে হত্যা কর" কথাটি নেই। তবে অন্যান্য ইমামগণ তা সহই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম আবু দাউদ-৩০৪৩।
[৪৮] মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৯৯, তুহফাতুল আহওয়াযি:১০/১৪৮
[৪৯] তুহফাতুল আহওয়াযি: ১/১৬৯, তিরমিযি-৩৬৮২, ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদীসটি হাসান সহিহ গরিব

তবে এক্ষেত্রে এই হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করলে বিভিন্ন কারণেই তা প্রশ্নযুক্ত হবে।

আর ইহুদী যাদুকর লাবীদ ইবনু আ'সামকে হত্যা না করার কারণ হলো—তখন ফিতনার আশংকা ছিল।

আল্লাহু আ'লাম।

কতিপয় আলিম বলেন, জিম্মি হলে হত্যা করা যাবে না। তবে বিশুদ্ধ মত হল জিম্মি এবং মুসলিম সকলেই যাদুর শাস্তিতে সমান।

চতুর্থ মাস'আলা

যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির যাদু কাটানো

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন, "যাদু কাটানোর দুইটা পদ্ধতি হতে পারে।

১) যেভাবে যাদু করা হয়েছে, ঠিক সে পদ্ধতিতে মুক্ত করা হবে। আর এটা শয়তানি কর্ম। এক্ষেত্রে হাসান বাসরি ﵀-এর কথাটি প্রযোজ্য হবে। তিনি বলেন, "যাদুকর ছাড়া কেউ যাদু মুক্ত করতে পারে না।" সুতরাং যাদু দিয়ে যাদু মুক্ত করার ক্ষেত্রে যাদুকারী এবং যাদু মুক্তকারী উভয়েই নিজ খাহেশাত পূরণে শয়তানের অনুসারী।

২) ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ, এবং শরীয়ত সম্মত দু'আ দরূদের মাধ্যমে যাদু মুক্ত করা হবে। এটা জায়েজ।"

ইমাম বুখারি ﵀ কাতাদা ﵀ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। কাতাদা ﵀ বলেন, "আমি সাইদ ইবনু মুসায়্যিবকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তিকে যাদু করা হয়েছে। কিংবা তার থেকে তার স্ত্রীকে কেড়ে নেয়া হচ্ছে। এখন কি এমন ব্যক্তির যাদু কাটানো জায়েয হবে?" তিনি বললেন, "কোনো সমস্যা নেই। কেননা এখানে কল্যাণ কামনা করা হচ্ছে। আর যা কল্যাণকর, তা থেকে আমাদের বারণ করা হয়নি।"

সুতরাং এটি রোগমুক্তি হিসেবে ধরা হবে। এবং তা নিষিদ্ধ হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা যদি আসলে এরকম না হয়ে অন্য কিছু হয় তাহলে জায়েয হবে না। কেননা নবী ﷺ এর হাদীস রয়েছে, যখন তাঁকে যাদু মুক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বললেন, "এটাও শয়তানের একটি কর্ম।"

---

[৫০] সহিহ বুখারি-৬৮৭৮, মুসলিম-১৬৭৬

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদে' এবং ইমাম আবু দাউদ আহমাদ থেকে, তিনি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি উকাইল ইবনু মা'কল থেকে, তিনি জাবের ﷺ এর মাধ্যমে হাদীসটি উল্লেখ করেন। এবং এর সনদটি হাসান পর্যায়ের।

যাদুকর, গণক, জ্যোতিষীদের কাছে গমন করা, কোন কিছু জিজ্ঞেস করা— মারাত্মক পর্যায়ে অপরাধ এবং কবিরা গুনাহ। এমন ব্যক্তির চল্লিশ রাতের সালাত গ্রহণ না করা হবে না।

ইমাম মুসলিম ﷺ তাঁর কিতাবে ২২৩০ নং হাদীসে উল্লেখ করেছেন, সাফিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গেল এবং কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তাহলে তার চল্লিশ রাতের সালাত গ্রহণ করা হবে না।”

আর যদি সে তাদের কিছু জিজ্ঞেস করে, এবং তাদের কথা বিশ্বাস করে, তাহলে তো সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত দ্বীনকে অস্বীকার করছে। ইমাম হাকেম তার কিতাবের ১নং খন্ডের ৮ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গেল এবং তার কথা বিশ্বাস করল, সে আমার আনীত দ্বীকে অস্বীকার করল।”

আল্লামা বাযযার ইবনু মাসউদ থেকে বিশুদ্ধ ও মওকুফ সনদে স্বীয় কিতাবের ২নং খন্ডের ৪৪৩ নং পৃষ্ঠায় একটি হাদীস এনেছেন। ইবনু মাসউদ বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো জাদুকর কিংবা গণকের কাছে গেল। তাকে বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীনকে অস্বীকার করল।”

ঈমান ভঙ্গের অষ্টম কারণ

মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা।

লেখক বলেন, "...ঈমান ভঙ্গের আরও একটি কারণ হলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা।[৫১] এর প্রমাণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদ ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরাহ মাইদা ৫:৫১)

---

[৫১] শায়েখ হাম্মাদ বিন আতীক 'মাজমু'আতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা: ২৯৫—২৯৬ এ লেখক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব থেকে উদৃত করে বলেন,

"কোন মুসলিম যদি কাফিরদের সাথে সহমত হয় এবং তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তাহলে এমন ব্যক্তির তিন অবস্থা।

১) সে ব্যাক্তি যদি তাদের সাথে প্রকাশ্যে একতা রাখে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। এবং তাদের অনুগামী হয়, তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাদেরকে সহযোগিতা করে। তাহলে এমন ব্যাক্তি কাফির। ইসলাম থেকে খারিজ। চাই সে এমনটা ইচ্ছায় করুক কিংবা অনিচ্ছায় (বাধ্য হয়ে) করুক।

২) আর যদি কোন ব্যাক্তি কাফিরদের সাথে গোপনে এবং অন্তরে অন্তরে দরদ ও ভালোবাসা রাখে, সহমতপোষণ করে, তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে; কিন্তু বাহ্যত তাদের সাথে বিরোধ প্রদর্শন করে, তাহলে এমন ব্যাক্তিও কাফির। তবে সে বাহ্যত ঈমান প্রকাশ করার কারণে তার রক্ত ও সম্পদ হারাম হবে। কিন্তু সে মুনাফিক থাকবে।

৩) কাফিরদের সাথে প্রকাশ্যে সহমত ও একতা প্রকাশ করে ঠিকই, কিন্তু গোপনে বা মনে মনে তাদের সাথে শত্রুতা রাখে এবং বিদ্বেষ পোষণ করে।

এমন ব্যক্তির আবার দুই অবস্থা,

১) সে ব্যক্তির অবস্থা এমন হতে হবে যে, সে কাফিরদের কর্তৃত্বে আছে এবং কাফিররা তাকে প্রহার করে ও বন্দী করে রাখে। এমনকি হুমকি দেয়, যদি সে তাদের সাথে একতা না রাখে, বিরোধিতা করে—তাহলে তাকে হত্যা করা হবে! তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য তাদের সাথে মুওয়াফাকাত (সহমত) করা জায়েজ আছে। তবে তার অন্তর 'মুত্বমাইন্ন বিল-ঈমান' (তাওহীদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসী) হতে হবে।

২) অন্তরে কাফিরদের প্রতি ঘৃণা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্ষমতা, সম্মান ও সম্পদ ইত্যাদির লোভে অথবা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচতে স্বপ্রনোদিত হয়ে প্রকাশ্যে তাদের পক্ষাবলম্বন করে। এমন ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। ভেতরে ভেতরে লালিত তার সেই ঘৃণা ও বিরোধিতা কোনো কাজে আসবে না। এধরনের লোকদের ব্যপারে আল্লাহ কুরআনে করেছেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"এটা এ জন্যে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন না।" (সূরাহ নাহল-১৬:১০৭) —অনুবাদক

সুতরাং মহান আল্লাহর বাণী

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরাহ মাইদা ৫:৫১)

এখানে مظاهرة শব্দের অর্থ একে অপরকে সাহায্য করা।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য ও সহযোগিতা করা এমন ভয়াবহ এক ফিতনা—যা কেবল ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়! এটা এমন এক সমস্যা—যা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়। কখনো সমাধান অযোগ্য হয়ে পড়ে। এই ফিতনা আহ্বান করে অন্তরসমূহকে, আর যেসব অন্তর মুশরিকদের ভালোবাসায় ঠাসা, তারা তাতে সাড়া দেয়, ঝুঁকে পড়ে। বিশেষত বর্তমান যুগে। যখন মানুষের মাঝে জ্ঞান কম, অজ্ঞতা বেশি, ফিতনার উপায় উপকরণও পরিপূর্ণ। সুন্নাহ ও আছার বিবর্জিত, নিশ্চিহ্ন! আর প্রবৃত্তি ও খাহেশাত গৃহীত, প্রতিষ্ঠিত।

আমার মনে হয় এর অন্যতম কারণ হলো—ইসলামি জ্ঞান অর্জনে মানুষের অনীহা, মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এবং ইউরোপীয় ও পশ্চিমা শিক্ষা-সংস্কৃতির দিকে ধাবিত হওয়া। ফলে ভালোটা মন্দ হয়ে দেখা দেয়, আর মন্দটা মনে হয় ভালো। এই শিক্ষার উপরই তাদের শৈশব। এর উপরই বার্ধক্য! সকল শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

সত্য পথের পথিক এ সমাজে খুব বিরল। বরং যারা দাবি করে, তাদের মাঝেও এর সংখ্যা অপ্রতুল। যদি তাদের মাঝে কোনো সাহায্যকারী চাওয়া হয়—তাহলে একজনও পাওয়া যাবে না। যদি তাদের কাছে একটি বছর আল্লাহর রাস্তায় সময় দিতে বলায় হয়, তো খুব মেহনত ও মুজাহাদার পর কিছু সংখ্যক পাওয়া যায়। আজ ইসলামের গরীবানা অবস্থা। ইসলাম গরীব হালতেই এসেছিল। এবং এই অবস্থায় আবারও ফিরে যাবে। সুসংবাদ সেসকল গুরাবাদের, যারা ফিতনার যুগেও নিজেদের পরিশুদ্ধ রাখে।

এই পরিশুদ্ধির অন্যতম ধাপ হলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকা। কেননা—তাদের সাহায্য করা মানে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়া।

আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল লতীফকে الموالاة (বন্ধুত্ব) এবং التولي (বন্ধুত্ব) এর তফাৎ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "আয়াতে التولي (বন্ধুত্ব) মানে হলো এমন কুফরি বন্ধুত্ব, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। আর সেটা হলো কাফিরদের নিরাপত্তা দেয়া। এবং তাদেরকে জান, মাল, তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করা।" *(উল্লেখ্য যে, এই অধ্যায়ের শুরুতে সূরা মায়িদার যে আয়াতটি আনা হয়েছে, তাতে "التولي" শব্দের ব্যবহার হয়েছে।- অনুবাদক)*

আজ যদি দুনিয়ার সকল মুসলিম জালেম তাগুতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত, একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করত, মুসলিম এবং ইসলামের এমন এক শান-শওকত ও শক্তি অর্জন হত, যার ফলাফলস্বরূপ অন্যান্য জাতি অপমান-অপদস্থ হয়ে থাকত। তারা মুসলিমদেরকে জিজিয়া কর দিত, যেভাবে তারা নিজ হাতে আল্লাহর নবীকে দিয়েছিল, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। মনে রাখা উচিত, এমন প্রত্যেক জিনিস যার মাধ্যমে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংখ্যা ও সরঞ্জাম বৃদ্ধির মাধ্যমে শক্তি অর্জন করে, সেসব তাদের হাতে তুলে দেয়াও কাফিরদের সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত।

ঈমান ভঙ্গের নবম কারণ

কাউকে শরীয়তে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঊর্ধ্বে বলে মনে করা

লেখক বলেন,

"...যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কিছু মানুষ শরীয়তে মুহাম্মাদীর উর্ধ্বে, যেভাবে তারা দাবি করে খিযির মূসা ﷺ-এর শরীয়তের উর্ধ্বে ছিলেন। এরকম বিশ্বাসের কারণে সে কাফির হয়ে যাবে।"

এই দাবি এবং বিশ্বাস আল্লাহর বাণীকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করে। আল্লাহ বলেন,

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

"এটাই আমার সঠিক সরল পথ, কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর, আর নানান পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।" (সূরাহ আন'আম ৬:১৫৩)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযি, ইমাম তয়ালুসি এবং দারিমি একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "একবার রাসূল ﷺ আমাদের সম্মুখে একটি লম্বা রেখা টানলেন। তারপর বললেন, এটা সাবিলুল্লাহ—আল্লাহর রাস্তা। অতঃপর এ লম্বা রেখার ডানে এবং বামে আরও কিছু লেখা টানলেন। আর বললেন, এ সব হচ্ছে বিচ্ছিন্ন পথ। প্রত্যেক পথে শয়তান রয়েছে, সে তার দিকে ডাকছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন,

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

"এটাই আমার সঠিক সরল পথ, কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর, আর নানান পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।" (সূরাহ আন'আম ৬:১৫৩)

ইমাম হাকেম ﷺ এই হাদীসের সনদকে সহিহ বলেছেন। যে ব্যক্তি শরীয়তে মুহাম্মদী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দাবি করবে, কিংবা নিজেকে এর উর্ধ্বে জ্ঞান করবে—তাহলে সে ব্যক্তি তার ঘাড় থেকে ইসলামের বন্ধনকে খুলে দিল।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ তাঁর রচিত "ফজলুল ইসলাম" নামক গ্রন্থে একটি বিস্তৃত অধ্যায় রচনা করেছেন। অধ্যায়ের নাম- "আল কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমে অন্যসব তন্ত্র, মন্ত্র ও পথ বর্জন করা আবশ্যক।"

আলোচিত এই অধ্যায়ের এক জায়গায় তিনি লিখেন, "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর কুরআন আমাদেরকে রাসূলের অনুসরণের আদেশ করে এবং তার অবাধ্য হতে নিষেধ করে। বরং তাঁর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া জাহান্নাম অবধারিত ও অপরিহার্য হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। যেমনটি মুসনাদে আহমাদ

এবং সহীহ বুখারিতে এসেছে আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "আমার প্রত্যেক উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে যে অস্বীকার করবে সে ছাড়া। সাহাবিগণ আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! অস্বীকারকারী কে? রাসূল ﷺ করলেন, 'যে আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকারকারী।"

অতঃপর ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ লিখেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

"আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, সত্য পথের নির্দেশ, রহমাত আর আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।" (সূরাহ নাহল ১৬:৮৯)

ইমাম নাসাঈ সহ আরও অনেকেই প্রিয় নবীর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একবার রাসূল ﷺ দেখলেন উমার ﷺ-এর হাতে তাওরাত কিতাবের কিছু পাতা। তিনি বললেন, "ওহে খাত্তাব পুত্র! তোমরা কি শরীয়তে মুহাম্মাদীর ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত? আরে আমি তো তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দ্বীন নিয়ে এসেছি! যদি মূসা ﷺ আজ জীবিত থাকতেন আর তোমরা তাকে অনুসরণ করতে, আমাকে ছেড়ে দিতে। তাহলে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হতে।"

অন্য বর্ণনায় আছে, "যদি মূসা ﷺ আজ জীবিত থাকতেন, তথাপি আমার অনুসরণের কোনো বিকল্প ছিল না।" অতঃপর উমার ﷺ বললেন, "আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে, আর মুহাম্মাদ ﷺ কে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট।"

এই হাদীসটি প্রমাণ করে শরীয়তে মুহাম্মদী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ কারো নেই। এবং এ ব্যাপারে অসংখ্য দলিল প্রমাণ বিদ্যমান।

মানুষের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি জানেন, ভয় করেন, মজবুত ঈমান রাখেন সাহাবিগণ, এবং আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের মাঝে তাঁদেরকে বাছাই করে প্রিয় নবীর সঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের কেউ কখনোই রাসূলের অনুসরণ, তাঁকে সম্মান, মর্যাদা দান ও তাঁর প্রতি যে বিধান নাযিল হয়েছে সেখান থেকে নিজেদেরকে ঊর্ধ্বে মনে করেননি।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ও বাযযার সহ আরও অনেকেই হাসান সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, "প্রথমে আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের অন্তরের দিকে তাকালেন। অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ

এর অন্তরকে সর্বোত্তম অন্তর হিসেবে পেলেন। তারপর তিনি তা তাঁর জন্য মনোনীত করলেন। নবুওয়াত সহ দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন। এরপর তিনি তাঁর সকল বান্দার অন্তরের দিকে তাকালেন, তিনি যে অন্তরগুলো অন্যসব অন্তর থেকে শ্রেষ্ঠ পেলেন, তাদেরকেই নবীর সাহাবি হিসেবে নির্ধারণ করে দিলেন। আর তারা তাঁর দ্বীনের উপর জীবনবাজি রেখে লড়াই করত। সুতরাং এ সকল মানুষ যা কল্যাণ মনে করবে সেটা আল্লাহর নিকট কল্যাণকর। আর তারা যা মন্দ ভাববে সেটা আল্লাহর নিকট মন্দ।"[৫২]

আল্লাহ্ সকল মানুষের উপর রাসূলের আনুগত্য ফরয করে দিয়েছেন। তারপরও মানুষের মধ্যে কিছু আছে, যারা তাঁর আনুগত্য করে। আর কিছু আছে, যারা তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত।

মানুষ দুই দলে বিভক্ত।

১) أمة إجابة সাড়া দানকারী উম্মাহ। অর্থাৎ যারা তার অনুসরণ করে এবং তার প্রতি যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে ধারণ করে।

২) أمة دعوة যারা তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার পর বলেন,

> "এদের মধ্যে কারো কারো ধারণা, শরীয়তে মুহাম্মদীকে ততক্ষণ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মারেফাত হাসিল হয়। যখন মারেফাত হাসিল হয়ে যাবে, তখন তার জন্য শরীয়তে মুহাম্মদী পালন করা আবশ্যক নয়। বরং সে তখন তাকভীনি (খোদায়ী এমন সব নিযাম, যা আমাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানের বাইরে) বিষয়ের মধ্যে চলাফেরা করে। অদৃশ্য জগতের নিয়ম মেনে চলে। অথবা কুরআন-সুন্নাহ ছাড়াই নিজের রুচিবোধ, ইচ্ছা ও রায় অনুযায়ী চলতে পারে। এদের মধ্যে কারো কারো পরিণাম হল এই যে—তারা শরীয়তের মূল অবস্থা থেকে সরে যায়। পাপিষ্ঠে পরিণত হয়। আবার কেউ কেউ আছে দ্বীনের আনুগত্য অমান্য করে। এরা একসময় ফাসিক হয়ে যায়। আর কিছু ঈমান হারিয়ে মুনাফিক, মুরতাদ কিংবা প্রকাশ্য কাফিরে পরিণত হয়। এই সংখ্যাটাই বেশি। এদের অধিকাংশই খিযির ও মূসা ﷺ -এর প্রসিদ্ধ ঘটনা দিয়ে দলিল পেশ করে।"[৫৩]

তিনি উক্ত কথার পর উল্লেখ করেন, মূসা ﷺ এবং খিজির এর ঘটনার মাধ্যমে তারা দুই পদ্ধতিতে প্রমাণ পেশ করে থাকে।

---

[৫২] হাইসামীর রচিত মাজমাউয যাওয়াইদঃ ৮/২৫৫, হাদীসটির প্রত্যেক রাবী নির্ভরযোগ্য
[৫৩] মাজমুউল ফাতাওয়া- ১১/৪১৮

১) তারা বলে—খিযির আল্লাহর ইচ্ছা এবং কর্মপদ্ধতি দেখতেন, বুঝতেন। অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। একারণেই শরীয়তের আদেশ-নিষেধের বিপরীত আমল করায় তাকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। আসলে এসব তাদের ভ্রান্তি এবং অজ্ঞতা। চরম পর্যায়ের ধৃষ্টতা, নিফাকি, ভণ্ডামি ও কুফরি। তাদের এই কথার অর্থ হলো—এ ব্যক্তি তাকদীর থেকে নিরাপদ এবং সে আল্লাহ তা'আলার কর্ম পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞাত। আর তার ওপর কোন আদেশ-নিষেধ নেই। তাহলে তো সকল আসমানি কিতাব আর আম্বিয়ায়ে কেরামের নবুওয়াতকে অস্বীকার করা হল!

২) এদের মাঝে অনেকের ধারণা ওলি আউলিয়াদের এই অবকাশ আছে যে—তারা শরীয়তে নববী থেকে মুক্ত। যেমন খিযির মূসা ﷺ এর অনুসরণ থেকে মুক্ত ছিলেন। ওলী আউলিয়াদের জন্য এ অধিকার আছে যে—তারা তাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বিশেষ সাধনা শক্তির মাধ্যমে কিছু বিষয় কিংবা সকল বিষয়ে রাসূলের আনুগত্য থেকে অমুখাপেক্ষী। তাদের অনেকে তো কিছু বিষয় কিংবা সকল বিষয়ে নবীগণের উপর ওলী-আউলিয়াদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে। আর তাদের দলিল ও চিত্তুতুষ্টি হলো খিজির- মূসার ঘটনা!

এ ধরনের কথাবার্তা চরম পর্যায়ের মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা। বরং তা কখনো নিফাক, বাড়াবাড়ি ও কুফরির চেয়েও মারাত্মক। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, রাসূল ﷺ আনীত দ্বীন সকল মানুষের জন্য অবধারিত, অপরিহার্য। আরব-অনারব, রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, আলিম-আওয়াম, জিন-ইনসান সকলের উপর এই ধর্মশাসন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এবং এই দ্বীন, এই ইসলাম- কিয়ামাত পর্যন্ত টিকে থাকবে। এই সৃষ্টি জগতের কারো অধিকার নেই তাঁর অনুসরণ, আনুগত্য ও আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। নিজেকে তাঁর থেকে মুক্ত কিংবা ঊর্ধ্ব জ্ঞান করবে, যেসব কাজের আদেশ এবং নিষেধ করা হয়েছে, তার বিপরীত কিছু করবে। আজ যদি পূর্ববর্তী নবীগণ জীবিত থাকতেন, তাদের জন্যেও এই দ্বীন ও শরীয়ত মেনে চলা আবশ্যক হত।"

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেন, "অসংখ্য সহিহ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, ঈসা ইবনু মারইয়াম যখন আসমান থেকে অবতরণ করবেন—তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শরীয়তে মুহাম্মাদীরই অনুসরণ করবেন। সে অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন।

নবীগণের মধ্যে যে এই শরীয়ত পাবে, তাঁর জন্যও যেখানে এই দ্বীন মেনে চলা, এই দ্বীনের সাহায্য করা আবশ্যক—সেখানে যারা নবী নয়, তাদের ব্যাপারে কি ধারণা?

ইসলামের সর্বজন গৃহীত একটি বিধান হল—যদি কারো নিকট রাসূল ﷺ এর দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো রাসূলের দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে; যেমন ঈসা (খৃষ্টান) ও মূসা (ইহুদী) ধর্মের, তথাপি সেটা জায়েয নেই। সুতরাং এক নবীর শরীয়ত থেকে বের হয়ে অন্য নবীর শরীয়তে যাওয়ারই যেখানে সুযোগ নেই, তখন কী করে শরীয়তে মুহাম্মাদী থেকে একেবারে বের হয়ে যাওয়াটা বৈধ হতে পারে?"

ইবনে তাইমিয়্যাহ আরও বলেন, "শরীয়তে মুহাম্মাদী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মূসা-খিযিরের ঘটনা দ্বারা দলিল দেওয়া সুস্পষ্ট ভুল। কেননা মূসা ﷺ খিযিরের নিকট প্রেরিত হননি। এবং আল্লাহ তা'আলা খিযিরের উপর মূসা ﷺ-এর অনুসরণ ও অনুকরণ আবশ্যক করেননি। বরং সহিহ বুখারি ও মুসলিমে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, খিযির বললেন, "ওহে মূসা! আল্লাহ আমাকে এমন কিছু জ্ঞান দিয়েছেন—যা তুমি জানো না। আর তোমাকে তিনি এমন জ্ঞান দিয়েছেন—যা আমি জানি না।" তার মানে মূসা ﷺ-এর দাওয়াত বা শরীয়ত ছিল নির্দিষ্ট একটি পরিমণ্ডলে।

সিহাহ সিত্তায় একথা প্রমাণিত যে, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন, "আল্লাহ ﷻ আমাকে সকল নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কেননা অন্য নবীগণ একটি বিশেষ জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হতেন। কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানুষের উদ্দেশ্যে।"[৫৪]

সুতরাং মুহাম্মাদ ﷺ এর দাওয়াত ও শরীয়ত সকল মানুষের জন্য। কারো এ অবকাশ নেই যে—সে এ শরীয়ত থেকে বেরিয়ে যাবে। এই শরীয়ত থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করবে। যেমন খিযির এর অবকাশ ছিল মূসা ﷺ এর অনুসরণ ও শরীয়ত থেকে মুক্ত থাকার। আল্লাহ তাকে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন, তার জন্য তিনি তা থেকে অমুখাপেক্ষী ছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম পেয়েছে, এই শরীয়ত পেয়েছে, সে কি মুহাম্মাদ ﷺ কে বলতে পারবে, "আমি আল্লাহ তা'আলার ইলম থেকে এমন কিছু ইলম পেয়েছি, যা আপনি পাননি!" যে ব্যক্তি এমনটা বৈধ মনে করবে, অথবা এই বিশ্বাস রাখবে যে—সৃষ্টিজগতে কোনো কোনো পীর-বুজুর্গ, ওলি-দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা আলিম শরীয়তে মুহাম্মাদীর ঊর্ধ্বে, তাহলে সকল ইমাম ও আলিমদের মতে সে কাফির! উক্ত বিষয়ে এখানে যা কিছু বলা হলো তার চেয়ে বিশাল আলোচনা, অগণিত প্রমাণ, কুরআন ও সুন্নাহতে রয়েছে।

---

[৫৪] মাজমুউল ফাতাওয়া: ১১/৪২০

মূসা-খিযিরের ঘটনায় শরীয়ত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মতো কোনো ব্যাপার ঘটেনি। কেননা—যখন খিযির এক এক করে তার সকল কর্মের কারণ বর্ণনা করতে লাগলেন, তখন কিন্তু মূসা ﷺ তাতে চুপ ছিলেন। একমত পোষণ করেছেন। কোন দ্বিমত করেননি। যদি খিযিরের কর্মগুলো মূসা ﷺ-এর শরীয়ত বিরোধীই হতো, তাহলে তিনি চুপ থাকতেন না। সহমত পোষণ করতেন না।"

এটাই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর বক্তব্য। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বোঝার জন্য এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট।

মোটকথা কোনো ব্যক্তিরই এ সুযোগ নেই যে—সে নিজেকে শরীয়ত মুক্ত দাবি করবে। যেমনটা কিছু কিছু সুফিয়ে ছু দাবি করে থাকে। তারা কুরআনের এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

> "আর তোমার রবের 'ইবাদাত করতে থাক তোমার নিকট ইয়াকিন আসার আগ পর্যন্ত।" (সূরাহ হিজর ১৫:৯৯)

তাদের মতে এখানে 'ইয়াকিন' দ্বারা ইলম ও মারেফাত উদ্দেশ্য। সুতরাং যার ইলম ও মারেফাত হাসিল হয়ে যাবে—তার জন্য আর শরীয়ত প্রয়োজন নেই। শরীয়তের সকল বিধান তার থেকে রহিত।[৫৫]

আসলে এসবই কুফরি। মনগড়া ব্যাখ্যা। অর্থের বিকৃতি। এমন ধারণা পোষণকারী ইসলাম থেকে বহিস্কৃত। এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ তার 'نونيه' তে কত চমৎকার কথাই না বলেছেন,

فالكفر ليس سوي العناد ورد ما   جاء الرسول به لقول فلان

---

[৫৫] এখানে الْيَقِينُ (ইয়াকীন) দ্বারা মারেফত উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা একথা সর্বজন বিদিত যে, নবীগণ এবং সাহাবায়ে কেরামগণের চেয়ে অধিক বিশ্বাস আর কারও হতে পারে না। তবু তাদের উপর আমরণ শরীয়তের বিধান পালনের দায়িত্ব ছিল। সেই সাথে তারা মৃত্যুপর্যন্ত তা গুরুত্বের সাথে পালন করে গিয়েছেন। কুরআনে এসেছে, ঈসা ﷺ বলেন,

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

"আমি আল্লাহর বান্দাহ, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আর আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন আর আমাকে সালাত ও যাকাতের হুকুম দিয়েছেন— যতদিন আমি জীবিত থাকি।" (সূরাহ মারইয়াম ১৯:৩০-৩১)

فانظر لعلك هكذا دون التي   قد قالها فتبوء بالخسران

"কুফর তো গোঁড়ামি এবং অমুক তমুকের কথার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনীত শরীয়তকে অস্বীকার করার- ই নাম।
আপনি লক্ষ্য করুন, হয়তো এর চেয়ে মারাত্মক কথা আপনি বলে ফেলেছেন, ফলে আপনি হয়ে গেছেন চরম ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"

সুতরাং যা রাসূল নিয়ে এসেছেন, তা প্রত্যাখ্যান করাই যখন কুফরি—তখন পুরো শরীয়ত থেকেই নিজেকে খারিজ করে নেওয়াটা তাহলে কেমন?

আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন।

ঈমান ভঙ্গের দশম কারণ

আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

লেখক বলেন,

"... অনুরূপভাবে আল্লাহর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, দ্বীন শিক্ষা না করা। এবং তার উপর আমল না করা। দলিল হলো আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

> "তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দান করা হলে সে তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব।" (সূরাহ সাজদাহ ৩২:২২)

এখানে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বীনের এমন সব মূল বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, বিমুখতা প্রদর্শন করা—যার দ্বারা একজন মানুষ মুসলিম থাকে। এটা ঈমান ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ। যদিও সে দ্বীনের শাখাগত বিষয়ে জ্ঞান না রাখে। কেননা শাখাগত বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করা আলিম ও তালিবে ইলমের কাজ।

শাইখ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান বিন হুসাইনকে "বিমুখতা প্রদর্শনের দ্বারা ঈমান ভেঙ্গে যায়" —এটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, "মানুষের মাঝে এই ইসলামি জ্ঞানের অনেক তফাৎ আছে। ভিন্নতা রয়েছে। ঈমানের ব্যাপারে তাদের মর্যাদার স্তর অনুপাতে ইলমের কম বেশি হবে, তবে যদি ঈমানের মূল বিষয় তার মাঝে উপস্থিত থাকে। আর সীমালঙ্ঘন ও শিরক পর্যায়ের বিমুখতা হলো ফরয বিষয়ে বিমুখতা প্রদর্শন করা। ওয়াজিব-মুস্তাহাব বিষয় নয়। অতএব, যখন ইসলামে টিকে থাকার মৌলিক ইলমটুকুও তার থাকবে না, এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিবে—তাহলে এই ধরণের বিমুখতা কুফরি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ,

> وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُولَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ
>
> "আমি বহু সংখ্যক জ্বীন আর মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না, তারা জন্তু-জানোয়ারের মত, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট, তারা একেবারে বে-খবর।" (সূরাহ আরাফ ৭:১৭৯)

আল্লাহ্ কুরআনে আরও বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ আর তাকে কিয়ামাতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।" (সূরাহ ত্ব-হা ২০:১২৪)

আল্লামা সুলাইমান বিন সাহমান বলেন, "শাইখের কথার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে—ইসলামে টিকে থাকার জন্য যে মৌলিক ইলমটুকু লাগে—তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কুফরি। এমন ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে। তবে ওয়াজিব-মুস্তাহাব এর ইলম ছেড়ে দেয়ার কারণে নয়।"[৫৬]

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ তার 'মাদারিজুস সালিকীন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "সবচেয়ে বড় যে কুফর—তা পাঁচ প্রকার। অতঃপর সেসব প্রকার আলোচনা করে বলেন, বিমুখতাও একটা কুফর। আর সেটা হলো নিজের কর্ণ ও কলবকে রাসূলের থেকে ফিরিয়ে রাখা। তাঁকে সত্যায়ন না করা, এবং মিথ্যারোপও না করা। তাঁকে শত্রু জ্ঞান না করা, আবার বন্ধুও মনে না করা। তাঁর আনীত দ্বীনের কাছে নিজেকে নত না করা।"

বিমুখতার এই আলোচনা থেকে আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে পূর্বের এবং বর্তমানের কবর পূঁজারীদের বিধান ও অবস্থা! তারাও রাসূলের আহ্বান থেকে, তাঁর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কান ও অন্তরে কুলূপ এঁটে বসেছিল। কোনো পথ প্রদর্শকের পথ, কোনো নসীহতকারীর নসীহত এরা শুনত না। আমলে নিত না। তাদের এই বিমুখতার কারণেই তাদের কাফির বলা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

"কিন্তু কাফিরগণ, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয় তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (সূরাহ আহকাফ ৪৬:৩)

এ কথা বলা যাবে না যে, তারা মূর্খ, তারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। অতএব এই অজ্ঞতার কারণে তাদের কাফির বলা যাবে না। কোনো অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যখন তার ভুলটা ধরা হয়, সত্যকে উপস্থাপন করা হয়, তখন সে ভুল থেকে ফিরে আসে। সত্যকে গ্রহণ করে। অথচ এ সকল লোকেরা মূর্তিপূজাতে লিপ্ত ছিল।

---

[৫৬] আদ্দুরারুস সুন্নিয়াহ: ১০/৪৭২-৪৭৩

না আল্লাহর কথায় কর্ণপাত করত আর না রাসূলের কথায়। বরং নসীহতকারীদের বাধা দিত। পথ আগলে দাঁড়াত। যাতে এ কষ্টের দ্বারা যে তাদের পাপ ও ভ্রষ্টতাকে অপছন্দ করে, তাকে বাধা দিতে পারে। তা না হলে তো তাদের বিপক্ষে প্রমাণ কায়েম হয়ে যাবে। জিদ আর গোঁড়ামি ছাড়া ভিন্ন কোনো ওযর থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

"তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দান করা হলে সে তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব" (সূরাহ সাজদাহ ৩২:২২)

ঈমান ভঙ্গের এ দশটি কারণ উল্লেখ করার পর লেখক বলেন, "দুষ্টুমি করে হোক, কিংবা বাস্তবেই, অথবা ভয়ের (সম্পদ ও সম্মানের ভয়) কারণেই হোক—যদি কারো থেকে ঈমান ভঙ্গের এসব কারণের কোনো একটিও প্রকাশ পায়—তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে যদি কাউকে কুফরের উপর বাধ্য করা হয়, তাহলে সমস্যা নেই। এতে তার ঈমান যাবে না। কেননা বলপ্রয়োগের স্বীকার হলে তা শরীয়ত সম্মত ওযর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার দিল ঈমানের উপর অবিচল থাকে।" (সূরাহ নাহল ১৬:১০৬)

বলপ্রয়োগ কর্মে (কুফরি কাজে বাধ্য করা) হতে পারে, কথার উপরও হতে পারে। তবে কেউ কেউ বলেন কর্মের ব্যাপারে হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের এ দাবি সঠিক না। কারণ তা আয়াতের বিপরীত।

লেখক বলেন, "এই প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর খুবই খতরনাক। এবং এখানে মানুষের পদস্খলনও বেশি।

শেষ কথা

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ তার 'কাশফুশ শুবহাত' নামক গ্রন্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন—সেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের বইটির সমাপ্তি টানতে যাচ্ছি। কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। কেননা, এই কথামালা এতক্ষণ যাবত আমরা যা আলোচনা করে এলাম তা সুস্পষ্ট করে দিবে। এবং আল্লাহ যেসব বিধান অলঙ্ঘনীয় করেছেন, তা পালনে বিমুখতা আর দ্বীনকে শিক্ষা করা, জানা ও বোঝার ব্যাপারে অনীহা থাকার কারণে অধিকাংশ মানুষ যে শুবাহ-সন্দেহ, অহেতুক প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে আছে, সেসব ঐ এক কথায় স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই যে, তাওহীদ (একত্ববাদ) হলো অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া; এবং তার ওপর আমল করা। যদি এ তিনটির কোনো একটির মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয়, তাহলে সে ব্যক্তি আর মুসলিম থাকবে না।

সুতরাং কেউ যদি তাওহীদকে বোঝে, স্বীকার করে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল না করে—তাহলে সে অবাধ্য ও একগুঁয়ে কাফির। যেমন ফিরআউন ও ইবলিশ, এবং তাদের মত যারা আছে। এখানে এসে অধিকাংশ মানুষ ভুল করে। তারা বলে, 'হ্যাঁ এই দ্বীন ও ধর্ম সত্য। আমরা এটা বুঝি। আমরা সাক্ষ্যও দিই যে এটা হক। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা সে অনুযায়ী আমল করতে অক্ষম! কেননা আমাদের দেশ ও আঞ্চলিকতায় তা উপযোগী নয়। তার বিধান পালন বৈধ নয়। তবে যদি সেটা আমাদের জন্য সহজাত হয়, কিংবা তাতে সংস্কার আসে, তো ভিন্ন কথা!" এই ধরনের ওযর আপত্তি তারা পেশ করে থাকে। কিন্তু এই হতভাগারা জানে না যে, কাফিরদের নেতারা তাওহীদ খুব ভালো করেই জানত, বুঝত। কিন্তু নানা অজুহাতে তারা সেগুলোকে বর্জন করত। এড়িয়ে চলত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আল্লাহর আয়াতকে তারা (দুনিয়াবী স্বার্থে) অতি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে, আল্লাহর পথে (মানুষদের চলার ক্ষেত্রে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তারা যা করে কতই না জঘন্য সে কাজ।" (সূরাহ তাওবা ৯:৯)

অন্যত্র বলেন,

الَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ الْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সে রকমই চিনে, যেমন চিনে নিজের পুত্রদেরকে, আর ওদের কতকলোক জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে থাকে।" (সূরাহ বাক্বারাহ ২:১৪৬)

যদি কেউ তাওহীদ অনুযায়ী প্রকাশ্যে আমল করে, অথচ সে তাওহীদ বোঝেনি; অথবা অন্তরে তাওহীদের বিশ্বাস স্থাপন করেনি—তাহলে সে মুনাফিক। আর এমন মুনাফিক কাফিরদের চেয়েও নিকৃষ্ট।

إِنَّ الْمُنَٰفِقِينَ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

"মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে, তুমি তাদের জন্য কক্ষনো কোন সাহায্যকারী পাবে না।" (সূরাহ নিসা ৪:১৪৫)

এই মাস'আলাটি খুবই দীর্ঘ এবং ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যদি তুমি মানুষের কথাগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করো—তাহলে তোমার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তুমি দেখবে মানুষ সত্যকে স্বীকার করে, কিন্তু তারপর আমল করে না। দুনিয়ার মান, মর্যাদা, স্ট্যাটাস প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষয় হওয়ার ভয়ে কিংবা কারো তোষামোদি ও চিত্তার্জনের কারণে! আবার দেখবে কেউ প্রকাশ্যে সে অনুযায়ী আমল করছে। কিন্তু অন্তরে নয়। যদি তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর তার বিশ্বাস সম্পর্কে, তাহলে দেখবে সে কিছুই জানে না। অতএব তোমার জন্য অত্যাবশ্যক হলো দুইটি আয়াত সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখা।

এক, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ

"ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছ।" (সূরাহ তাওবা ৯:৬৬)

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো, কিছু সাহাবি যারা আল্লাহর রাসূলের সাথে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে; কিন্তু সাহাবিদের সম্পর্কে তারা হাসি-মজাকের উদ্দেশ্য কিছু বাজে কথা বলেছে, ব্যস তারা কাফির হয়ে গেছে! যদি আপনি এই আয়াতটি বোঝে থাকেন, তাহলে আপনার নিকট ঐসকল লোকদের অবস্থা স্পষ্ট

হয়ে যাবে, যারা কুফরি কথা বলে, কিংবা জান-মাল, মান-সম্মান অথবা অন্যের পদলেহন ও মনতুষ্টি ছুটে যাওয়ার ভয়ে কুফরি কর্ম করে। তারা তো সাহাবিদের নিয়ে খেল-তামাশার ছলে মন্তব্য করা ঐ ব্যক্তিদের চেয়েও গুরুতর!

দুই, আল্লাহ ﷻ বলেন,

> مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا عَلَى الْءَاخِرَةِ
>
> "কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয়, যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার দিল ঈমানের উপর অবিচল থাকে। এর কারণ এই যে, তারা আখিরাত অপেক্ষা দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালবাসে।" (সূরাহ নাহল ১৬: ১০৬-১০৭)

আল্লাহ ﷻ এমন লোকদের ওযর আপত্তি গ্রহণ করবেন না। তবে যদি তাকে বাধ্য করা হয়—কিন্তু তার অন্তর ঈমানে ভরপুর, তাওহীদের বিশ্বাসে দৃঢ়—তাহলে সেটা ভিন্ন। অন্যথায় সে ঈমান আনার পরেও কাফির হয়ে যাবে। চাই সে এমনটা ভয়-ভীতি, আশা-লালসা, অন্যের তল্পিবহন, পদলেহন, তোষামোদি, স্ত্রী-স্বজন, পরিবার-পরিজন, মান-সম্মান, সহায়-সম্পদ হারানোর আশঙ্কায় করে থাকে, কিংবা তার কুফরি কর্মটা শুধু হাসি-তামাশা অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে সে কাফির!

সুতরাং আয়াতটি দুটি বিষয়ের উপর ইঙ্গিত করে,

১) আয়াতের إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ (অর্থাৎ যাদের কুফরি করতে বাধ্য করা হয়, তারা ছাড়া) এই অংশ দ্বারা কেবল আল্লাহ ﷻ ঐ সকল লোককে আলাদা করেছেন—যাদের বাধ্য করা হয়েছে। আর এটা জানা কথা যে, মানুষকে কেবল কথা ও কর্মের উপর বাধ্য করা যায়—অন্তরের বিশ্বাসের উপর নয়। সেখানে কারো কর্তৃত্ব চলে না।

২) আল্লাহর বাণী,

> ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا عَلَى الْءَاخِرَةِ
>
> "এর কারণ এই যে, তারা আখিরাত অপেক্ষা দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালবাসে" (সূরাহ নাহল ১৬:১০৭)

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুফর এবং আযাব শুধু ভ্রান্ত বিশ্বাস, দ্বীন সম্পর্কে বিদ্বেষ, অজ্ঞতা কিংবা কুফরকে ভালোবাসার কারণে নয়; বরং তার আসল কারণ হলো এসকল কাজে তার দুনিয়াবি স্বার্থ আছে। দুনিয়া পাওয়ার লালসা রয়েছে। ফলে সে দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়।

আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।”

পরিশিষ্ট

পাঠক!

ইতোপূর্বে আমরা এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি, যা ঈমানকে ধ্বংস করে। আমলকে বরবাদ করে। এবং ব্যক্তিকে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা বানিয়ে ছাড়ে। আমরা তা পড়েছি। অবগতি লাভ করেছি। সুতরাং এখন আমাদের জেনে নেয়া উচিৎ যে, যদি কোনো মুসলিম এমন কোনো কথা বলে, কিংবা এমন কোনো কাজ করে, যা কুরআন-সুন্নাহ এবং ইমামগণের ইজমা-কিয়াসের ভিত্তিতে কুফরি। এবং ঐ ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। তথাপি আলিমগণের ভাষ্যমতে কারো থেকে কুফরি প্রকাশ পেলেই তাকে নির্দিষ্টভাবে তাকফীর তথা কাফির বলে দেয়া সঙ্গত নয়।

সুতরাং কারো থেকে কুফরি কাজ প্রকাশ পেলেই তাকে 'কাফির' বলে দেওয়া যাবে না। কেননা কথা বা কাজ কখনো কখনো কুফুরী হলেও—ঢালাওভাবে কুফরির হুকুম ঐ বক্তা বা কর্তার উপরে ছুড়ে দেয়া যায় না। কিছু নিয়মকানুন অবশ্যই আছে। হতে পারে তার থেকে তাকফীরের শর্ত ও আলামত প্রকাশ পেয়েছে বটে, তবে তা প্রয়োগে কোন না কোনো প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান! যেমন—লোকটি হয়তো ইসলামে নতুন। সে হয়তো কোনো কুফরি কাজ করে বসলো, কিন্তু সে জানে না যে এটা কুফরি। পরে যখন জানল, বিষয়টা তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিলো—তখন সে তার ভুল বুঝতে পারলো, এবং অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এলো। তাই তাকফীরের ক্ষেত্রে এরকম অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খুব গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দিয়ে বোঝা উচিৎ। কেননা তাকফীর করা মাখলুকের অধিকার না যে—মন চাইলো, আর যাকে তাকে কাফির ফাতওয়া দিয়ে দিলো। বরং আবশ্যক হলো সালফে সালিহীনের বুঝ মোতাবেক কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া। অতঃপর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ যাকে কাফির বলেছেন, এবং এই রকম কোনো প্রমাণ যার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তো সে কাফির, অন্যথায় সে কাফির নয়।

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যা আবু হুরায়রাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। প্রিয়নবী ﷺ বলেন,

"পূর্বযুগে এক লোক অনেক পাপ করেছিল। যখন তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো, সে তার পুত্রদেরকে ডেকে বলল, 'মৃত্যুর পর আমার দেহ-হাড় মাংসসহ পুড়িয়ে ছাই করে নিও। এরপর প্রবল বাতাসে তা উড়িয়ে দিও। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ্ আমাকে ধরে ফেলেন—তাহলে তিনি

আমাকে এমন কঠিনতম শাস্তি দিবেন যা পৃথিবীর অন্য কাউকে দেননি।' প্রিয়নবী ﷺ বলেন, 'যখন তার মৃত্যু হল, তখন পরিবারের লোকেরা তাই করল। অতঃপর আল্লাহ্ জমীনকে আদেশ করলেন, তোমার মাঝে ঐ ব্যক্তির যা আছে জমা করে দাও। যমীন তা করে দিলো। এ ব্যক্তি তখনই দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসে তোমাকে এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করল?' সে বলল, 'হে প্রতিপালক! কেবল আপনার ভয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"[৫৭]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ﵀ তাঁর মাজমূউল ফাতাওয়ার ১৩ নং খন্ডের ২৩৩ নং পৃষ্ঠায় বলেন, "লোকটির এই কথা বলা— 'আমাকে পুড়িয়ে তার ছাইগুলো বাতাসে উড়িয়ে দিও' মানেই হলো সে আল্লাহর কুদরত, সক্ষমতা, এবং পুনরুত্থান দিবসের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে। বরং সে বিশ্বাস করেছে—এমনটা করা হলে তাকে আর পুনরুত্থিত করা হবে না। এই ধরণের বিশ্বাস সকল মুসলিমের মতেই কুফরি। কিন্তু লোকটি ছিল অজ্ঞ। সে তা জানত না। সে ছিল এমন এক মুমিন—যে আল্লাহর ভয়ে ভীত! তাই এ কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে ইমামগণের সিদ্ধান্ত হলো—এই ভাবে ক্ষমা প্রার্থনার চেয়ে রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া অধিক উত্তম এবং ফলপ্রসূ।"

ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ তাঁর "মাসাইলুল মারিদীনিয়্যাহ" নামক কিতাবের ৭১ নং পৃষ্ঠায় বলেন, "এ বিষয়ের মৌলিক কথা হচ্ছে, কথাটা যদি সুস্পষ্ট কুফরি হয়, তাহলে ঐ কথার বক্তাকে সাধারণভাবে তাকফীর করা হবে। নির্দিষ্ট করে নয়। (অর্থাৎ আমভাবে তার ঐ কথাকে তাকফীর করা হবে, নির্দিষ্টভাবে ঐ ব্যক্তিকে নয়) যেমন বলা হবে, 'যে এমন কথা বলে, সে কাফির!' কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে—যে এমনটা বলেছে তাকে কাফিরে বলে দেয়া যাবে না—যতক্ষণ না তার উপর 'কাফির' ফতোয়া দেয়ার মত কোনো দলিল প্রমাণিত হয় এবং কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে।"

মোটকথা, বিজ্ঞ আলিমগণের সিদ্ধান্ত হলো কর্মকে তাকফীর এবং কর্তাকে তাকফীর করার মাঝে পার্থক্য আছে। অনুরূপ বিদ'আতের মাঝেও। কথা অথবা কর্মকে বিদ'আত বলা, বক্তা এবং কর্তাকে বিদ'আতি সাব্যস্ত করার মাঝেও তফাৎ আছে। সুতরাং কেউ বিদ'আতের কাজ করলেই তাকে বিদ'আতি বলে দেয়া যাবে না।

যে ব্যক্তি আসলাফগণের জীবনীর দিকে তাকাবে—সে এই আলোচনার বাস্তবতা বুঝতে পারবে। উপলব্ধি করতে পারবে তাদের মতামত ও সিদ্ধান্ত দানের পদ্ধতিটা

[৫৭] বুখারী- ৩৪৮১, মুসলিম- ২৭৫৬, নাসাঈ- ২০৭৯

এমনই ছিল। সে দেখতে পাবে—তাঁরা কতটা বাড়াবাড়ি মুক্ত এবং ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সত্যের পক্ষে বলতেন—আবার মানুষের কল্যাণকামিতা ও হিদায়াতের ব্যাপারেও দিল ভরা আকাঙ্ক্ষা রাখতেন। এ কারণে আল্লাহ তাদের ইলমে নাফি' (উপকারী ইলম) এবং আমালে সালিহার (নেক কাজ) দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন। শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অতএব, সকলের জন্য আবশ্যক হলো ন্যায়-ইনসাফের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ মনন নিয়ে বাতিলের মূলোৎপাটন এবং সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্যকে স্থির করা। অভিন্নভাবে কাজ করে যাওয়া। যতক্ষণ না দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷫ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷫ নজদের উয়াইনাহ শহরে ১১১৫ হিজরি তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের একজন আলিম এবং সে সময়কার একজন বিচারক। তিনি প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা পান তাঁর পিতা আব্দুল ওয়াহহাব বিন সুলায়মানের কাছ থেকে। পিতার কাছ থেকেই কুরআন হিফয, সুন্নাহ এবং ফিকহের পাঠ লাভ করেন। মাত্র দশ বছর বয়সেই তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। এবং দেশের বিভিন্ন উলামাদের নিকট তাফসীর এবং হাদিস চর্চায় লিপ্ত হন। বিশেষ করে মদীনার উলামাদের নিকট শরীয়তের বিভিন্ন দিক নিয়ে পড়াশোনা করেন। আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ হতে তাওহীদ বুঝেন। মক্কা মদীনায় তিনি নজদের বিখ্যাত আলিম শাইখ আব্দুল্লাহ বিন ইবরাহীম এবং ভারতবর্ষের আলিম শাইখ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব হায়াত এর কাছে ইলম অর্জন করেন।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷫ নিজের দেশ নজদ এবং তাঁর আশে পাশের অঞ্চলের শিরক, কবর পূজা, বিদ'আত এবং নানা রকমের কুসংস্কার আর ইসলামের পরিপন্থী কাজ দেখে শঙ্কিত হলেন। নিজ দেশের বিবাহ উপযুক্ত যুবতী মেয়েদের দেখলেন পুরুষ খেজুর গাছের কাছে দুয়া করছে, "ওহে বনস্পতি, বছর না ঘুরতেই আমি চাই পতি।"

হিজাযে দেখলেন, সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইয়্যাত এবং রাসূল ﷺ এর কবর গুলোকে কেন্দ্র করে ইবাদাত হচ্ছে—যা হওয়ার কথা ছিল বায়তুল্লাহ তথা আল্লাহ্র ঘরে। কবরকে সামনে রেখে সিজদা, তাওয়াফ হচ্ছে। মদীনায় তিনি শুনলেন আল্লাহ ছাড়া রাসূল ﷺ এর কাছে মানুষ প্রার্থনা করছে। মনের কামনা বাসনা মিটানোর ফরিয়াদ করছে। অথচ এটা ছিল নবী ﷺ এর দাওয়াতের বিপরীত বিষয়, এবং তা চাওয়ার হকদার ছিলেন মহান আল্লাহ্। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷫ মানুষকে আহবান করা শুরু করলেন—তারা যেন একমাত্র আল্লাহকেই ডাকে, তাঁর কাছেই চায় এবং বিশুদ্ধ তাওহীদকে গ্রহণ করে।

কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দাওয়াত একসময় স্থানীয় বিদ'আতি আলিমদের সাথে ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব ﷫- এর বিরোধ তৈরি করে। তাঁকে নিজের শহর ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ ইলম অর্জনের জন্য ইরাকের বসরায় গমন করেন। সেখানে তিনি মুহাম্মাদ আল মুজমুই ﷺ এর কাছে ইলম অর্জন করেন

বসরা থেকে ফিরে ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ হুরায়মিয়া শহরে তাঁর বাবার সাথে থাকতে শুরু করেন। আর সেখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব *'কিতাবুত তাওহীদ'* রচনা করেন। সেসময় বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁকে সমর্থন করা শুরু করে। সেই সাথে শত্রুদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। যিনা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার কারণে দাসদের একটা গোষ্ঠীর সাথে ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ -এর বিরোধ লেগে যায়। তারা তাঁকে একবার হত্যার চেষ্টাও চালায়, কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে তিনি আবারও নিজের শহর আল উনাইনাহয় ফিরে আসেন।

উনাইনাহতে ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ তখনকার আমীর উসমান বিন হামদের নিরাপত্তা লাভ করেন। সেখানে তিনি পুরোদমে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। চারদিকে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আমীররা ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ এর জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারেনি। তথাপি প্রচলিত স্রোতের বিপরীতে বিশুদ্ধ তাওহীদের দাওয়াত তাদের গাত্র দহনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আমীররা উয়াইনাহর আমীর উসমান ইবনু হামদকে প্ররোচিত করতে থাকে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবকে হত্যা করার জন্য। অবশেষে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব উয়াইনাহ ছেড়ে দারিয়াহ চলে আসেন। সেখানকার আমীর মুহাম্মাদ বিন সৌদ ইমাম আব্দুল ওয়াহহাবের দাওয়াতে প্রভাবিত হন এবং সেখানে তিনি নিরাপত্তা লাভ করেন। পরবর্তীতে আমীর আল সৌদ নিজ মেয়েকে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের সাথে বিয়ে দেন।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ এর ছয় জন ছেলে ছিল। হুসাইন, আব্দুল্লাহ. হাসান, আলি, ইবরাহীম এবং আব্দুল আযীয। আব্দুল আযীয অল্প বয়সে মারা যায়। বাকি ছেলেরা পিতার দাওয়াতের প্রচারে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছেন।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ মূলত শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ লেখালেখিতে মূলত তাওহীদের উপর জোর দিলেও সীরাত, হাদিস, ঈমান, সালাত এবং ইসলামের অন্যান্য অঙ্গনেও তিনি কলম চালিয়েছেন।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ রচিত কিতাবের মধ্যে আছে,

কিতাবুল কুরআন

কিতাবুল তাওহীদ

কাশফুশ শুবহাত

উসুলুল সালাসা

আল কাওয়াইদুল আরবা

উসুলুস সিত্তাহ

নাওয়াকিদুল ইসলাম

আদাব আল মাসাইল আস-সালাহ

উসুলুল ঈমান

ফাযায়েলুল ইসলাম

ফাযায়েলুল কুরআন

মাজমু আল হাদিস আলা আবওয়ালুল ফিকহ

মুখতাসারুল ঈমান

মুখতাসুল ইনসাফ ওয়াল শারহুল কাবির

মুখতাসার সীরাতুর রাসূল

কিতাবুল কাবাইর

কিতাবুল ঈমান

আর রাদ আলাল রাফিদা

এই মহান আলেমে দ্বীন ১২০৬ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

শাইখ সুলায়মান ইবনু নাসির আল উলওয়ানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শাইখ সুলায়মান ইবনু নাসির ইবনু আবদুল্লাহ আল-উলওয়ানের জন্মে বিলাদুল হারামাইনের আল-ক্বাসিম প্রদেশের বুরাইদা শহরে, ১৩৮৯ হিজরিতে। শাইখ সুলায়মান ইলম শিক্ষা শুরু করেন ১৫ বছর বয়সে। শুরু থেকেই শাইখ সুলায়মান শারীয়াহর বিভিন্ন ব্যাপারে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তাঁর বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির কারণে প্রশংসিত ছিলেন।

প্রথম দিকে শাইখ সুলায়মান মনোনিবেশ করেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কায়্যিম, ওলামায়ে নজদ এবং ইবনু রজব হাম্বলীর রচনাবলী, ইবনু হিশামের রচিত সীরাহ এবং ইবনু কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার অধ্যয়নে। ফজর, যুহর, মাগরিব ও ইশা– প্রতি ওয়াক্তের সালাতের পর একজন করে মোট চারজন আলিমের নিকট তিনি প্রতিদিন গমন করতেন।

দিনে কতো ঘন্টা তিনি পড়াশোনা করেন, এ প্রশ্নের জবাবে শাইখ সুলাইমান বলেন–১৫ ঘন্টার চাইতে সামান্য বেশি। মদীনাতে তিনি শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারির অধীনে ইলম শিক্ষা করেন। শাইখ হাম্মাদের কাছ থেকে তিনি সিহাহ সিত্তাহ সহ, মুসনাদে আহমাদ, ইমাম মালিকের মুয়াত্তা, সাহিহ ইবনু খুযায়মাহ, সহিহ ইবনু হিব্বান, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ও মুসান্নাফ আবি শায়বাহ শেখানোর ইজাযাহ লাভ করেন।

শাইখ হাম্মাদের কাছ থেকে শাইখ সুলায়মান তাফসির ইবনু কাছির, তাফসির ইবনু জারির, ইবনু মালিকের আল-আলফিয়্যাহ, এবং ফিকহের বিভিন্ন কিতাবের উপরও ইজাযাহ লাভ করেন। এছাড়া মক্কা থেকেও তিনি একই ধরণের ইজাযাহ অর্জন করেন। শাইখ সুলাইমান আল-আল্লামা শাইখ হামুদ বিন উক্বলা আশ শু'আইবিরও ছাত্র।

শাইখ সুলায়মান সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহিস সনদ অনুযায়ী হাদীস বর্ননাকারীদের সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তিনি এমন ব্যক্তির কাছ থেকে নিজে হাদীস শুনেছেন যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির কাছ থেকে শুনেছে, যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির কাছ থেকে শুনেছে...যা শেষ পর্যন রাসুলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

শাইখ নিয়মিত নিজ অঞ্চলের মসজিদে দারস দিতেন। বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, মুয়াত্তা মালিক, সুনান আবি দাউদ, বুলুগুল মারাম, উমদাত আল আহকাম, ইমাম নাওয়ায়ির চল্লিশ হাদিস– এই কিতাবগুলো ছাত্রদের শেখাতেন। এছাড়া তিনি ছাত্রদের শেখাতেন মুসতালাহ আল-হাদিস, ইলাল, ফিকহ, তাফসির এবং আরবি ব্যাকরণ। এছাড়া আকিদার নিম্নোক্ত বইগুলোর উপর তিনি শিক্ষাদান করতেন –

আল-আকিদা আল তাদমুরিয়্যাহ, আল আকিদা আল হামাউইয়াহ, আল আকিদা আল ওয়াসিতিয়্যাহ, কিতাবুত তাওহীদ (মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ), আশ শারীয়াহ (আল-আজুররি), আস সুন্নাহ (আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ), আল-ইবানাহ (ইবনু বাত্তাহ), আস সাওয়াইক্ব এবং আন ন্যূনইয়্যাহ (ইবনুল কাইয়্যিম)

শাইখ সুলায়মান ১৮ বছর বয়সে কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। আর বিশের কোঠায় থাকা অবস্থাতেই তিনি মুখস্ত করেন ছয়টি হাদিস গ্রন্থের পাশাপাশি নিম্নোক্ত বইগুলো এবং এগুলোর ব্যাখ্যা (শারহ) –

কিতাব আত তাওহিদ, আল ওয়াসিতিয়্যাহ, আল হামাউইয়্যাহ, আল বায়কুনিয়্যাহ, উমদাত আল-আহকাম, আল আরজুমিয়্যাহ, নুকবাত আল ফিকর, আর রাহবিয়্যাহ, বুলুগুল মারাম, উসুল আস-সালাসা, আল ওরাক্বাত, মূলহাত আল-ই'রাব, আল-আলফিয়্যাহ, কাশফ আশ-শুবুহাত।

শাইখ সুলায়মান আল উলওয়ান বিবাহসূত্রে শাইখ ইউসুফ আল-উয়ায়রি ﷺ-এর আত্মীয় এবং তাঁরা উভয়ে ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। বর্তমানে সৌদি শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা করার কারণে মিথ্যা অভিযোগে শাইখ সুলায়মানকে দ্বিতীয়বারের মতো কারাবন্দী করা হয়েছে। আল্লাহ শায়খের সময়, হায়াত ও ইলমে বরকত দান করুন, এবং শায়খের কল্যানময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। আমীন।

একজন বান্দার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কী? ঈমান! আবার সেই বান্দা যদি ঈমান হারা হয়ে পড়ে, তবে তার চেয়ে বড় দুর্ভাগা আর কে আছে! মণি-মুক্তা, হীরে-জহরত, মূল্যবান সম্পদ, টাকা-পয়সা কত যত্ন করে আমরা আগলে রাখি, নিরাপত্তার কত সব আয়োজন। কিন্তু ঈমানের সুরক্ষায় আমরা কতটুকু সচেতন হই? সেই মূল্যবান ঈমান আছে কি নেই, নষ্ট হয়ে গেলো কি না, শিরক আর কুফরের ফাঁদে পড়ে কলুষিত হয়ে গেলো কি না, কতটুকু খবর রাখি আমরা? অথচ ঈমানহীনতা আমাদের জন্য নিয়ে আসবে ভয়াবহ দুর্ভোগ, জ্বলতে হবে জাহান্নামের লেলিহান শিখায়। এই বইটি ঈমানের সেই অস্তিত্ব পরীক্ষার মানদণ্ড। এখানে এমন দশটি বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার কারণে একজন মানুষ ঈমানহারা হয়ে পড়তে পারে। হয়ত সে জানেও না, হয়ত সে একেবারে বেখবর, বুঝতেও পারছে না কখন সে জাহান্নামের পথে হাঁটা ধরেছে। এসব বিষয় জেনে নিয়ে ঈমান রক্ষার শক্ত এক রক্ষাকবচ তৈরি করা তাই প্রতিটি মুসলিমের জন্য অতীব জরুরী।